দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

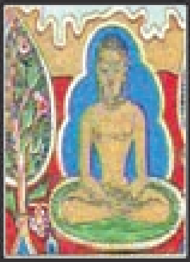

সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' — বৈধ অথবা অবৈধ?

.. পৃঃ ১১

বেদে গণিতের অস্তিত্ব

.. পৃঃ ২১

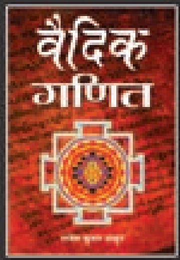

৬৭ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ৪ মে ২০১৫।। ২০ বৈশাখ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

জন্ম-সার্ধশতবর্ষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ২০ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

৪ মে - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ■ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ■ ৬-৯

যেরকম দাপটের সঙ্গে ভোটে রিগিং করেছে তাতে তৃণমূলের বিপুল জয় প্রত্যাশিত ■ গূঢ়পুরুষ ■ ১০

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘সমাজতন্ত্র’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’— বৈধ অথবা অবৈধ? ■ বিনয়ভূষণ দাশ ■ ১১

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা ■ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ■ ১৩

রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর : দেশপ্রেম সঞ্জাত একটি রসায়ন ■ অর্ণব নাগ ■ ১৬

বেদে গণিতের অস্তিত্ব ■ দীননাথ বত্রা ■ ২১

সেবাকার্যের পরম্পরার বিভিন্ন ভারতীয় সংগঠন ■ রবীন সেনগুপ্ত ■ ২৩

অস্পৃশ্যতা-মুক্ত সমাজ চাই ■ ডা: প্রবীণ তোগাড়িয়া ■ ২৭

ড. আম্বেদকর ও সামাজিক ন্যায়বিচার ■ অধ্যাপক আশিস রায় ■ ২৯

সন্ত্রাসবাদের আমরা-ওরা ■ শবরী ঘোষ ■ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ■ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ■ **অঙ্গনা : ২৬** ■ **অন্যরকম : ৩৩** ■ **পুস্তক প্রসঙ্গ: ৩৫** ■ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭** ■ **খেলার জগৎ : ৩৯** ■ **শব্দরূপ : ৪০** ■ **চিত্রকথা : ৪১** ■ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

গো-হত্যায় নিষেধাজ্ঞা : খাদ্যাভাসে হস্তক্ষেপ ?

মহারাষ্ট্র সরকার নিজের রাজ্যে গো-হত্যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইতিপূর্বে দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাটেও গো-হত্যা নিষিদ্ধ। মহারাষ্ট্র সরকারের সাম্প্রতিক এই ঘোষণায় মানুষের খাদ্যাভ্যাসের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অনেক আগেই দেশের মুসলমান শাসক ও বিদ্বজ্জনেরা এর উত্তর দিয়েছেন। এই নিয়েই আলোচনা করেছেন দেবব্রত চৌধুরী। মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধেয় মীর মশার্‌রফ হোসেন-এর একটি লেখাও এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জমি বিল লইয়া কংগ্রেসের রাজনীতি

আমাদের দেশে দশকের পর দশক ধরিয়া কৃষকেরা অবহেলার শিকার। চাষির সঙ্কটের কারণ লইয়া কাহারও কোনোকালে ভাবনা চিন্তা ছিল না। দেশের উন্নয়ন হইয়াছে কিন্তু সেই তুলনায় কৃষির উন্নয়ন হয় নাই। কংগ্রেস সুদীর্ঘকাল দেশ শাসন করিয়াছে। কংগ্রেস নেতাদের মতে তাঁহারাই নাকি দেশের কৃষকের স্বার্থ দেখিয়াছেন, বরং আজ নরেন্দ্র মোদী সরকার কৃষকদের সর্বনাশ করিতে সংসদে জমি অধিগ্রহণ বিল আনিয়াছে। সত্যিই কি তাই? শুধুমাত্র রাজ্যসভায় এই বিল আটকাইয়া কি কৃষকদের দুঃখদুর্দশা লাঘব করা যাইবে? প্রশ্ন হইল, এই বিল এখনও পাশ হয় নাই। তবে কেন উত্তরপ্রদেশ, বিহারে কৃষকেরা আত্মহত্যা করিতেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসিবার পর ১২৫ জন আলুচাষি আত্মহত্যা করিয়াছেন কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া থাকেন দেশের মধ্যে তিনিই নাকি একমাত্র কৃষকের বন্ধু। তবুও তাঁহার রাজত্বেই কৃষকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিতেছে। যদিও প্রশাসন আত্মহত্যার ঘটনা স্বীকার না করিয়া দায় এড়াইতে সিদ্ধহস্ত। মহারাষ্ট্রে আখচাষি, তুলোচাষিও কংগ্রেসী আমলে নিত্য আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু আজ হঠাৎ কংগ্রেসের কৃষক বন্ধু সাজিবার কারণ কী? যে কংগ্রেস-মুক্ত অর্থনীতি, কর্পোরেট লবির দালালি করিত তাহারা আজ কৃষকপ্রেমী হইলেন কোন্ যুক্তিতে? যে কংগ্রেস ২০১৩ সালে জমি আইনে বলিয়াছিল প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সেচ, রেল ইত্যাদির জন্য জমি লইলে কৃষকদের সম্মতির দরকার হইবে না—তাহারাই আজ তাহাদের তৈরি আইনের বিরোধিতা করিতেছে কেন? আসলে মোদী সরকারের এক বৎসরের শাসনকালে দ্রব্যমূল্যের তেমন একটা মূল্যবৃদ্ধি ঘটে নাই, মুদ্রাস্ফীতি স্থিতিশীল, দেশের অর্থনীতিও ঊর্ধ্বমুখী। আর্থিক সংস্কারের কর্মসূচিতে মোদী সরকারকে সফল হইতে দিলে কংগ্রেস আর কোনোকালেই সরকারে আসিতে পারিবে না। তাই রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার দোহাই দিয়া মোদী বিরোধিতা। মোদী উন্নয়নের কথা বলিতেছেন। দেশে শিল্প স্থাপন না হইলে উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। শিল্পের জন্য প্রয়োজন জমি। পথঘাট নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া হাসপাতাল, বিদ্যুৎকেন্দ্র সকল বিষয়ে নির্মাণের জন্য জমির প্রয়োজন। কংগ্রেস এই উন্নয়ন আটকাইয়া মোদীকে শিক্ষা দিতে চায়। বস্তুত সংসদের ভিতরে বা বাহিরে রাহুল গান্ধী কৃষকদের দুর্দশা লইয়া যতই জ্বালামুখী বক্তব্য রাখুন না কেন, ঘটনা হইল তাঁহার বাস্তবের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নাই। যোগাযোগ নাই বলিয়াই গজেন্দ্র সিংহের আত্মহত্যার মতো ঘটনার মুখোমুখি হইবার পরেও রাহুল গান্ধী বর্তমান সরকারের জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বিষোদ্গারের উপলক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। প্রশ্ন হইল, এত বছর দেশ শাসন করিয়াও কংগ্রেস দেশের কৃষিসমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয় নাই। একমাত্র মোদী সরকারই এই কাজে বাস্তব লক্ষ্যে উদ্যোগী হইয়াছে। তাই এই বিরোধিতা। বিজেপি সাংসদ মীনাক্ষী লেখি যথার্থই বলিয়াছেন—'যাহারা জমি বিলের বিরোধিতা করিতেছে তাহারা পূর্বে ঘোষণা করুক বিলের কোন অংশ কৃষকস্বার্থ বিরোধী।' কিন্তু মেকি আন্দোলনের নামে যাহা চলিতেছে তাহা আসলে রাজনীতি। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী প্ররোচনা দিয়া ইতিমধ্যেই একজন মানুষকে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য করিলেন যিনি প্রকৃত কৃষকই নন, একজন দলীয় কর্মীমাত্র। এই অপকর্মের পর অবশ্য দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা চাহিয়াছেন। বিরোধীদের অভিযোগ, মোদী সরকার নাকি পুঁজিপতিদের হাতে জমি তুলিয়া দিতে আগ্রহী। কিন্তু অবৈধভাবে কাহারা পুঁজিপতিদের তুষ্ট করিয়াছিল এযাবৎকাল? কয়লার ব্লকগুলি অবৈধভাবে কর্পোরেটদের হাতে কাহারা তুলিয়া দিয়াছিল? কর্পোরেট গোষ্ঠীকে সুযোগ সুবিধা দিতে কাহারা দুর্নীতি করিয়াছিল? স্পেকট্রাম নিলামে কাহারা সুবিধা পাইয়াছিল? রাজস্থান, হরিয়ানায় কৃষকদের জমি ব্যবসার জন্য কাহার জামাই কৃষকদের বঞ্চিত করিয়াছে? ইহার পরেও জমিবিল লইয়া মোদীকে গালিগালাজ কেন?

সুভাষিতম্

ধনং ক্ষীণং ভবেদ্দানাদ্ বিদ্যা দানাদ্বিবর্ধতে।
তস্মান্মন্যে ধ্রুবং বিদ্যা ধনাদপি গরীয়সী।। (চাণক্যনীতি)
ধন দান করলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বিদ্যা দান করলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেজন্য বিদ্যা ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এই পুর-নির্বাচন বাঙালি ও বাঙলার সংস্কৃতির মুখে চুনকালি মাখালো

দেবব্রত ঘোষ ॥ তৃণমূল জমানায় ২০১৫ সালের ১৮ এপ্রিল কলকাতা পুরসভার ভোট এবং ২৫ এপ্রিল রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ৯১টি পৌরসভার নির্বাচনের ভোট বাঙালি ও বাঙলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গরিমাকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছে। প্রকসিভোট, বুথ জ্যাম, বুথ দখল, বিরোধীপ্রার্থীদের ওপর আক্রমণের নজির আমরা বাম জমানায় দেখেছি, কিন্তু বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ, সৎ পুলিশের ওপর তৃণমূলীদের গুলিচালনা, অসৎ পুলিশ কর্তৃক সাংবাদিক হেনস্থা, সম্মিলিত নির্বাচনী সন্ত্রাস আগের সব নজির ও উদাহরণকে ছাপিয়ে গিয়েছে। অনেক মৃত ব্যক্তির ভোটও এবার পড়েছে এবং খোদ কলকাতা শহরেই। ভোটের আগে থেকে শুরু করে ভোটের দিনও শহর জুড়ে তৃণমূলের মোটর-বাইক বাহিনী দাপিয়ে বেড়িয়েছে নির্বাচনী বিধিনিষেধের বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে। তৃণমূল নেতা প্রতাপ সাহা বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলির ওপর আক্রমণে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছিল, তার কোনো শাস্তি তো হলেই না উপরন্তু তৃণমূল দল ও সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে ছাড়া পেয়ে গেল। তৃণমূলীদের হাতে রূপা গাঙ্গুলি আবার আক্রান্ত হলেন ২৫ মে সোনারপুরে।

কাটোয়ার একটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ভয় দেখাচ্ছে দুষ্কৃতীরা।

২৫ এপ্রিল রাজ্যের যে ৯১ টি পুরসভায় ভোট হয়ে গেল সেগুলির মধ্যে যেসব পুরসভা বিরোধীদের অধীনে ছিল বা যেসব লোকসভা কেন্দ্রে অথবা বিধানসভা কেন্দ্রে গত নির্বাচনের নিরিখে বিরোধীরা এগিয়ে ছিলেন বা বিজেপি কিংবা সিপিএম প্রার্থীরা জয়লাভ করেছিলেন সেইসব কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস অনেক বেশি মাত্রায় গণ্ডগোল করেছে, কারণ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ প্রতিটি পুরসভায় প্রতিটি ওয়ার্ড তাঁর চাই। এমনকী নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি নিজের হাতে ক্যামেরা হাতে নিয়ে বুথে ঢুকে ছবি তুলেছেন কোন্ ভোটার কাকে ভোট দিচ্ছে। এমন উদাহরণ পশ্চিমবাংলায় প্রথম ঘটলো, সারা ভারতেও সম্ভবত প্রথম।

উত্তর দমদমের অনেকগুলো বুথ সকাল থেকেই জ্যাম করে রাখা হয়েছিল। ব্যাপক গুলি আর ইটবৃষ্টি চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। প্রকাশ্য রাস্তায় তৃণমূলী গুণ্ডারা হাতে রিভলবার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ ভোটারকেও গুলি করা হয়েছে। দক্ষিণ দমদমেও একই চিত্র।

দুই ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, হুগলী, বীরভূম, বাঁকুড়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুর—সর্বত্রই সন্ত্রাসের বাতাবরণ। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলি অনেকদিন ধরেই বেআইনি অনুপ্রবেশের কারণে আমাদের রাজ্যে জনসংখ্যার ভারসাম্য বিঘ্নিত করেছে, মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় অনেক বেশি এবং তোষণের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (অবশ্য আর কিছুদিন বাদেই হিন্দুরাই সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে ওই সব এলাকায়) ভোটব্যাঙ্ক তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং প্রশাসনের মদতে ও নির্বিকারত্বে তাদের একটা বড়ো অংশই সন্ত্রাস সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্ভুক্ত কামারহাটি, বেলঘরিয়া, বিরাটি, মধ্যমগ্রাম, বারাসাত, হাবড়া, সোদপুর, ভাটপাড়া, ব্যারাকপুর, কাঁচড়াপাড়া, কল্যাণী, হালিশহর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত রাজপুর-সোনারপুর, বারুইপুর, কাকদ্বীপ, ক্যানিং, ভাঙড়, ডায়মন্ডহারবার সহ আরো অনেক এলাকায় হিটলার-স্ট্যালিন যৌথরাজ কায়েম থাকায় বহু ভোটের ভয়ে ভোট দিতেই যাননি। কারণ তাঁর হয় সিপিএম, নয় কংগ্রেস নতুবা বিজেপি সমর্থক বলে চিহ্নিত। সোনারপুর পৌরসভার ৩০ নং ওয়ার্ডে একটা বুথে রঞ্জিত নামের এক মাতাল ও তার ছেলে বুথের মধ্যে ঢুকে ভোটারদের আদেশ দিয়েছে জোড়াফুল চিহ্নে ভোট দিতে হবে।

উত্তরবঙ্গে দিনহাটা, মাথাভাঙা, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার সদর, শিলিগুড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর, ফালাকাটায় বহিরাগত মাসলম্যানরা এসেছে ভোটারদের চমকাতে যে কাজে তারা সফল। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে আমরা নির্বাচনী সন্ত্রাসের নিদর্শন আমরা দেখেছি। মেদিনীপুরের কাঁথি, তমলুক, নন্দকুমার, ঘাটাল, পাঁশকুড়া, ঝাড়গ্রাম, চন্দ্রকোণা; বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর, ছাতনা; বীরভূমের লাভপুর, বোলপুর, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, পাড়ুই; হুগলীর আরামবাগ, বাঁশবেড়িয়া, চাঁপাডাঙা, শ্রীরামপুর, চন্দননগর; বর্ধমানের কাটোয়া, মেমারি, কালনা-সর্বত্র শুধু সন্ত্রাস আর মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে তৃণমূলের সাম্রাজ্য কায়েমের হিটলারি অপচেষ্টা। কলকাতা পুলিশের যে বা পরিকাঠামো আছে, রাজ্য পুলিশের সেটা নেই, এছাড়া গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো শাসকদলের ভয় (যদি চাকরি চলে যায় বা বহুদূরে কোথাও বদলি করে দেওয়া হয়), অতএব রাজ্য পুলিশ চোখ-কান বুজে হয়ে থেকেছে আর অবাধে ভোট লুঠ হয়েছে।

কুখ্যাত জামাত নেতা বাংলাদেশি নুরুদ্দিন আলি নদীয়া জেলায় সীমান্তবর্তী এলাকায় সদলবলে ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে সহস্রাধিক অনুপ্রবেশকারী জামাতপন্থীদের নিয়ে আর আমাদের রাজ্য সরকার নদীয়ার এসপিকে নির্দেশ দিয়েছে তাদের যেন বিব্রত করা না হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী এলেও তাদের পক্ষে তেমন কিছু করা সম্ভব হয়নি, কারণ কোনো এলাকার সব রাস্তাঘাট, অলিগলি চেনা বাইরে থেকে আসা বিএসএফ জওয়ানদের পক্ষে অসম্ভব যদি না তারা স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে সহযোগিতা পায়।

অনেক ওয়ার্ডেই একাধিক বুথে ১০০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে এবং সর্বাধিক প্রদত্ত ভোটের হার ১৪২ শতাংশ অর্থাৎ কোনো বুথে ৫০০ জন ভোটার থাকলে ভোট পড়েছে ৭১০টি। মোট ভোটারের চাইতে ভোটের সংখ্যা এতো বেশি হয় কী ভাবে? ব্যাপক ছাপ্পা ভোট সিপিএম জমানার ৩৪ বছরের রিগিংকে ছাপিয়ে গিয়েছে। নির্বাচন আইন অনুযায়ী, প্রতিটি বুথের প্রিসাইডিং অফিসারের নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর, নির্বাচন অফিসকে সেই বুথে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা জানানোর কথা যেটা অনেক প্রিসাইডিং অফিসার করেননি।

১৮ এপ্রিল আক্রান্ত হলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সাংবাদিক সৌরভ ব্যানার্জি ও বর্তমান পত্রিকার সাংবাদিক সায়ন্ত ভট্টাচার্য। (ক) দক্ষিণ কলকাতার ১০৯ নং ওয়ার্ড (শহীদ স্মৃতি কলোনি), ১০৯ নং ওয়ার্ডে (ব্রিজি), ১০১ নং ওয়ার্ড (আদর্শ বিদ্যামন্দির), (খ) উত্তর কলকাতার ৩,৪,১৮ নং ওয়ার্ড, (গ) মধ্য কলকাতার ২১,২২,২৫,২৭,৩৬ ও ৬০ নং ওয়ার্ডে (ঘ) পূর্ব কলকাতার ৩২,৩৩,৩৪ এবং ৩৫ নং ওয়ার্ডে আমরা দেখলাম হিটলার-স্ট্যালিন কায়দায় গণসন্ত্রাসের নারকীয় উদাহরণ।

তৃণমূল জমানায় শহরে ও মফস্‌সলে ও জেলাগুলোর অনেক ক্লাব প্রচুর পরিমাণে আর্থিক অনুদান ও সাহায্য পেয়েছে এবং ওই ক্লাবগুলোকে নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে নির্লজ্জভাবে। নির্বাচনের কয়েকদিন আগে থেকেই, বিভিন্ন এলাকা থেকে মাস্তানবাহিনী ও সশস্ত্র মাসলম্যানের দল এনে রাখা হয়েছিল ওই ক্লাবগুলোতে, ঢালাও খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থা মজুদ ছিল তাদের জন্য। এককেটা ওয়ার্ড পিছু লক্ষাধিক টাকা শুধুমাত্র এই খাতেই ঢালা হয়েছে, লাইনে শাসানো, মেয়েদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা, ভোটার স্লিপ কেড়ে নেওয়া, বুথের ভেতরে গিয়ে দেখে নেওয়া কে কোন্ দলকে ভোট দিচ্ছে, এটাই ছিল বহিরাগত গুণ্ডাবাহিনীর কাজ এবং শাসকদলের নেতা-কর্মী ও তাঁবেদার প্রশাসন এই কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে।

২২নং ওয়ার্ডে একজন এসিপি মর্যাদার পুলিশ অফিসার বিনা কারণে এবিপি আনন্দের প্রতিনিধিকে সপাটে চড় মারলেন, অবশ্য চড়টা মারার আগে পাশে দাঁড়ানো তৃণমূল নেতার কাছে অগ্রিম অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলেন।

সিংহীবাগান (ওয়ার্ড ২৫) তৃণমূল কংগ্রেস গুণ্ডার গুলিতে একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টার জগন্নাথ মণ্ডল গুরুতর আহত হলেন। ৩২ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল নেতা ও কর্মীরা সিপিএম নেত্রী রূপা বাগচীর শাড়ি খুলে নেবার হুমকি দিলেন প্রকাশ্যে, এই ঘটনার নায়ক ছিলেন তৃণমূল নেতা পল্লব চক্রবর্তী।

নির্বাচন কমিশনার প্রথমে বললেন কলকাতা পুরভোটে ভোট পড়েছে ৬২ শতাংশ আর ২ দিন বাদেই বলেন ভোট পড়েছে ৬৮ শতাংশ। সুশান্ত উপাধ্যায় একজন ডব্লুবিসিএস অফিসার (রিটায়ার করার পরে এক্সটেনসানে আছেন)। তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। তিনি একবার বলেন, শহরে অনেক ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনে অশান্তি ও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে, নির্বাচন অবাধ হয়নি। তারপরে বললেন দু-চারটে বুথে সামান্য বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। তারপরেই বলে বসলেন, কোথাও কোনো অশান্তি বা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি, তাই কোনো বুথেই পুনর্নির্বাচনের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি আইনগতভাবে ও প্রশাসনিকভাবে দায়বদ্ধ রাজ্যপালের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নন। এই মেরুদণ্ডহীন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অঙ্গুলিহেলনে চলেন যেটা পূর্বতন নির্বাচন আধিকারিক আই এ এস মীরা পাণ্ডে করতেন না।

তৃণমূল কংগ্রেস দলটা যদি সত্যি সত্যিই রাজ্যের সব মানুষের উন্নয়ন করে থাকতো তাহলে সেই নিরিখেই তারা ভোট পেয়ে যেতো, রিগিং করার দরকারই পড়তো না। এই বলগাহীন সন্ত্রাস প্রমাণ করে দিয়েছে তৃণমূলের পায়ের তলায় মাটি নেই, শুধুমাত্র প্রশাসন যন্ত্র হাতে থাকায় তারা বলীয়ান। আর সারদা, রোজভ্যালি, এমপিএস, গোল্ডমাইন, আইকোর এবং আরো অসংখ্য চিট ফান্ডের টাকা তাদের হাতে থাকায় তৃণমূল অর্থবলেও বলীয়ান এবং সেই অর্থ তারা কাজে লাগিয়েছে গুণ্ডাবাহিনী পোষায় যারা সমগ্র রাজ্যে নির্বাচনী সন্ত্রাস চালিয়েছে। নির্বাচনের নামে এই প্রহসনের কি কোনো প্রয়োজন ছিল? অনুপ্রবেশে রাজ্য বিপন্ন। ইসলামিক জিহাদে বিপন্ন হিন্দু। কী পেলে এ রাজ্যের সংখ্যালঘু তোষণকারী নির্লজ্জ এবং চাটুকার পরিবৃত, এক-ব্যক্তি নির্ভর শাসকদল? ■

মানুষ মানুষের মল পরিষ্কার করবে এটা আর চলতে দেওয়া হবে না : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১২৫ তম জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে দলিতদের যাতে আর নিজের হাতে মানুষের মল পরিষ্কার করতে না হয়, তার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, মানুষ মানুষের মল পরিষ্কার করবে— এটা কি চলতে দেওয়া উচিত? এটা কি শোভন? বাবা আম্বেদকরের ১২৫ তম জন্মদিনে এই কলঙ্ক থেকে আমাদের মুক্ত হওয়া উচিত। কোনো দরিদ্র ব্যক্তি এই কাজ এখনও করবে— এটা আমাদের সহ্য করা আর একেবারেই ঠিক নয়। তাঁর বক্তব্য— এক্ষেত্রে আমাদের সমাজের সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকার নিশ্চয়ই তার দায়িত্ব পালন করবে। এই প্রচেষ্টা যাতে সফল হয় তার জন্য আমার সমাজের সাহায্যের প্রয়োজন।

তিনি ঘোষণা করেন, দিল্লীতে আম্বেদকরের নামে একটা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ও মুম্বইতে আম্বেদকর স্মারক তৈরি করা হবে।

কেন্দ্র সরকার প্রায় ৯ হাজার এনজিও-র লাইসেন্স বাতিল করলো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্র সরকার বিদেশি ফান্ড সংগ্রহ করে এখন প্রায় ১০ হাজার এনজিও-র লাইসেন্স বাতিল করলো। এই এনজিও-গুলি ফরেন কনট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট (এফ সি আর এ) উল্লঙ্ঘন করায় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অন্য এক আদেশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে যে, ২০০৯-'১০, ২০১০-'১১ এবং ২০১১-'১২ সালে বার্ষিক রিটার্ন দাখিল করার জন্য ১০ হাজার ৩৪৩টি এনজিও-কে নোটিশ জারি করা হয়েছিল। ২০১৪ সালের ১৬ অক্টোবর এই এনজিওগুলিকে ১ মাসের মধ্যে তাদের রিটার্ন দাখিল করতে বলা হয়েছিল এই মর্মে যে তারা কত টাকা বিদেশি চাঁদা সংগ্রহ করেছে, কোথা থেকে পেয়েছে, কী উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছে এবং কীভাবে তার উপযোগ হয়েছে। মোট ১০ হাজার ৩৪৪টি এনজিও-র মধ্যে মাত্র ২২৯টি জবাব দিয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ঘোষণা করেছে যে, জবাব না দেওয়ার কারণেই এনজিওগুলির লাইসেন্স বাতিল করা হলো।

লাল চন্দন পাচার মামলায় তেলুগু অভিনেত্রী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ রক্তচন্দন চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত ফেরার তেলুগু অভিনেত্রী নীতু আগরওয়ালকে গত ২৬ এপ্রিল গ্রেপ্তার করেছে। অভিনেত্রী আগরওয়াল ২০১৩ সালে মস্তান বলি নির্মিত ফিল্মে 'প্রেম প্রয়াণম'-এ অভিনয় করেছিলেন। কুর্জুল পুলিশ কমিশনার এ. রবিকৃষ্ণ জানিয়েছেন, অভিনেত্রীকে কোর্ট হাজতে পাঠানো হয়েছে। ২৭ বছরের অভিনেত্রীকে নিয়ে রক্তচন্দন পাচারের অভিযুক্তর সংখ্যা ১০ দাঁড়ালো। শ্রী রবিকৃষ্ণন আরো জানিয়েছেন, মূল্যবান কাঠ পাচারের অপরাধে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান পিনাল কোড গঠন ও অরণ্য আইন লঙ্ঘনের ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

হিন্দি গান শুনিয়ে ভোটের প্রচারে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ খাস বিলেতেও ভোটের প্রচারে হিন্দি গান। সেই গান শুনিয়েই বৃটেনের ১৬ লক্ষেরও বেশি ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে তোয়াজের চেষ্টা করছেন বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন। আগামী ৭ মে বৃটেনের সাধারণ নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ এপ্রিল লন্ডনের একটি সভায় 'নীলা হ্যায় আসমান', গানটি গেয়ে শোনান। এবং তাঁকে বলতেও শোনা গিয়েছে, বৃটেনের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ বা এশীয় প্রধানমন্ত্রী হবেন কনজারভেটিভ পার্টিরই কোনো সদস্য।

কালবৈশাখীর গ্রাসে মালদহের শতাব্দী প্রাচীন বটগাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২১ এপ্রিল গভীররাতে মালদহের গ্রামে কালবৈশাখী আছড়ে পড়ে। এতে গাজোল থানার বেশিরভাগ গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাজোলের পূর্বদিকে সোনাপুর গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের গম্ভীরাতলার শতাব্দী প্রাচীন বটগাছ উপড়ে পড়ায় স্থানীয় মানুষ ভীষণভাবে মর্মাহত হয়েছেন। বটগাছের তলায় শিব-কালী মন্দিরের মতোই এলাকার মানুষ বটগাছটিকেও সমানভাবে পূজা করতেন।

Design's For Modern Living
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12,
Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

ছত্তিশগড়ে উপর্যুপরি মাও হানায় টার্গেট পুলিশ-ই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল, তিন দিনের ব্যবধানে ছত্তিশগড়ে উপর্যুপরি চারটি নকশাল হামলা উস্কে দিয়েছে জল্পনা যে পুলিশ শিবির হঠাতেই কি তাদের এই মরিয়া আক্রমণ? ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার কমললোচন কাশ্যপের বক্তব্য, গত ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ শিবির স্থাপনের পর থেকেই মাওবাদীরা তা বিঘ্নিত করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। যে একশোটা গ্রামে বিগত দিনে তারা রাজ করত তা হাতছাড়া হওয়ার ভয়েই মাওবাদীরা স্থানীয়দের উস্কে দেবার নানা চেষ্টা করে। কিন্তু সফল হতে পারেনি। উপর্যুপরি আক্রমণের সূত্রপাত গত ১১ এপ্রিল। সুকমার কাঙ্কেরলানকায় ছত্তিশগড়ের এস টি এফ দলের ওপর হামলায় সাতজন নিহত ও এগারোজন আহত হন। এরপরের দিনই কাঙ্কেরের দু'জায়গায় কোরাল ও বান্দেতে দু'টি হামলা হয়। প্রথম ঘটনায় নকশালরা ১৮টি বড়ো পণ্য পরিবহণকারী গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। দ্বিতীয় ঘটনায় বি এস এফের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। এক জওয়ান নিহত হন। দান্তেওয়াড়ার কিরানদুলে ১৩ এপ্রিলের হামলায় পাঁচ সি এ এফ জওয়ান নিহত ও সাতজন আহত হন।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মাও হামলার গতি প্রকৃতি থেকে স্পষ্ট মাওদের টার্গেটে এবার প্রত্যক্ষভাবে নিরাপত্তারক্ষীরা। এই প্রবণতা তাদের আগেও ছিল। কিন্তু সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষও ছিল তাদের লক্ষ্যবস্তু। মাও-দমনে ছত্তিশগড় সরকার বরাবরই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু বিগত জমানায় কেন্দ্রের নরম নীতির সুযোগ নকশালরা বারবারই নিয়েছে। এখন কেন্দ্রে জমানা বদলে যাওয়ায় সরকার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রেরও এই আপোসহীন মনোভাবে মাওবাদীরা স্পষ্টতই প্রমাদ গুনেছে। সূত্রের খবর, এবার মাওবাদীদের টার্গেটে রয়েছে একটি ছোটো সেতু। যা দিয়ে সবসময়ই পণ্য-পরিবহণকারী গাড়ি যাতায়াত করে এবং যেখানে গাড়ির গতি ধীরে হয়ে যায়। ভয়াবহ নৃশংসতা চালানোর জন্য মাওবাদীরা এই জায়গাটিকে বেছে নিয়েছে।

বিগত দিনগুলিতে ছত্তিশগড় নেহাত কম মাও-হামলা দেখেনি, বিশেষ করে ২০১০ সালের ৬ এপ্রিল আই ই ডি বিস্ফোরণে ৭৬ সি আর পি এফ জওয়ানের হত্যা এবং ২০০৭-এর ১৫ মার্চ রানি বদলি আউটপোস্টে মাও হামলায় ৫৫ জন পুলিশকর্মীর হত্যা এযাবৎ নিরাপত্তারক্ষীদের ওপর তাদের হামলার সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। সেই জাতীয় আরও ঘটনা ঘটিয়ে রাজ্যের পুলিশবাহিনীর ওপর চাপ বাড়াতে চাইবে বলে গোয়েন্দা সূত্রে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। দান্তেওয়াড়ার পুলিশ সুপার কাশ্যপের জীবনহানিরও আশঙ্কা করা হয়েছে। মাওবাদীদের এই বাড়-বাড়ন্তের পেছনে বিদেশি শক্তির উস্কানি থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। কেন্দ্র রাজ্য উভয়েই এবিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে ও নজরদারি করতে শুরু করেছে।

মাও-বৃদ্ধি

সাল	মাও-হামলা গ্রস্ত জেলা	মাও-প্রভাবিত জেলা
২০১৪	৭৬	১০৬
২০১২	৯৫	১৪১
২০০৯	১১২	১৯৫
২০০৭	১১৫	১৯৪
২০০৫	৬৯	১৬৫

২০০৫-এ আরও ৩৪টি জেলায় তাদের প্রভাব বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয় মাওবাদীরা

মাও-কর্মসূচির দিনপঞ্জি

২৬ জানুয়ারি, ১৫ আগস্ট : কালা দিবস

১০ ফেব্রুয়ারি : ভূমকাল দিবস

৮ মার্চ : অন্তর্রাষ্ট্রীয় মহিলা দিবস

জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যবর্তী সময় :

১ মে : মজদুর দিবস

৯ সেপ্টেম্বর : মাও শহীদ দিবস

২১ সেপ্টেম্বর : পার্টি স্থাপনা সপ্তাহ

নেপাল ও ভারতে ভূকম্প দুর্গতদের সেবাকাজে মুক্তহস্তে দান করুন

চেকে / নগদে সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

BASTUHARA SAHAYATA SAMITI
Camp office : Keshab Bhawan
9-A, Avedananda Road, Kolkata -6
Ph. : (033) 2350-8075

সরাসরি ব্যাঙ্কে সাহায্য পাঠানোর জন্য

UCO BANK,
Beadon Street Branch
A/c. No. 17390100003251
IFSC / RTGS code : UCBA0001739

আপনার দেওয়া সাহায্য আয়করের 80G (5)(vi) ধারায় আয়করমুক্ত

যে রকম দাপটের সঙ্গে ভোটে রিগিং করেছে তাতে তৃণমূলের বিপুল জয় প্রত্যাশিত

‘দিদির দুর্নীতির দাপটে আগেই মা, মানুষ কেঁপেছে। এবার দিদির দাপটে শনিবারে মাটি কাঁপলো।’ টুইটার, ফেসবুকে এমন অজস্র মন্তব্য রাজ্যের পুরসভার ভোট এবং দেশজুড়ে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর শোনা গেছে। একথা ঠিকই দিদির দলের ভাই ভাইপোদের দাপটে বাংলার মা-মাটি-মানুষ এখন থরহরি কম্পমান। পুরসভার নির্বাচন যদি সেমিফাইনাল হয়, তবে ২০১৬-র বিধানসভার নির্বাচনের ফাইনালে পশ্চিমবঙ্গ নিশ্চিতভাবেই বিরোধীশূন্য হবে। বামেরা আগেই ইতিহাস হয়ে গেছে। আমরা অনেকেই ভেবে ছিলাম যে রাজ্য বিজেপি প্রতিরোধ গড়বে। কিন্তু সেই ভাবনা বাস্তব হয়নি। নেতারা দলের রাজ্য অফিসে বসে সাংবাদিক বৈঠকে গরম গরম বিবৃতি দিয়েই দায় সেরেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিরোধীদল শূন্য হোক এমনটাই চান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অতীতে সিপিএম ক্ষমতা দখলের পর রাজ্যকে বিরোধী শূন্য করার চেষ্টা করেছিল। গ্রামবাংলা আক্ষরিক অর্থেই লাল দস্যুদের গড় ছিল। রাজ্যের ৯০ শতাংশ গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল লাল পার্টির দখলে। গ্রামের বাড়িতে বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন সব ব্যাপারেই পার্টির নেতারা নাক গলাতেন। পার্টির নেতারা অনুমোদন করলে তবেই অন্য গ্রামের মেয়েকে ঘরের বউ করে আনা সম্ভব ছিল! আলিমুদ্দিনের যে নেতা একদা গর্ব করে তাঁর পেটোয়া সাংবাদিকদের বলতেন, ‘বাংলার মাটি আমাদের দুর্জয় ঘাঁটি’, সেই নেতাটি এখন গালে সাদা দাড়ি রেখে আঁতেল মার্কা চেহারা নিয়ে আলিমুদ্দিনের ঠাণ্ডা ঘরে বসে পদ্য লিখছেন। পশ্চিমবঙ্গকে বিরোধী শূন্য করতে গিয়ে সিপিএম নিজেই শূন্য হয়ে গেছে।

মোদী লহরে বাংলায় বিজেপি-র অভূতপূর্ব উত্থান হয়েছিল। কিন্তু দশ মাসের মধ্যেই সেই উত্থানের চিহ্ন উধাও। একটা ক্ষীণ আশা ছিল যে কমরেডরা ঘরে ঢুকে গেলেও বিজেপি কর্মীরা লড়বেন। বাস্তবে সেই আশা ছলনা হয়েই রয়ে গেল। কর্মীদের দোষ নেই। তাঁরা লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে চলে যেতে চাননি। রাজ্য নেতৃত্বের রহস্যজনক প্রবল অনীহা কর্মীদের মনোবল নষ্ট করেছে। রাজ্যের সংবাদমাধ্যমের রটনা যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জমি বিল সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিল রাজ্যসভায় পাশ করাতে ‘মমতা দিদিকে’ খুশি রাখতে চায়। এই গুজব বা রটনা কিছুটা হলেও বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছে। কলকাতা সহ রাজ্যের পুরসভার নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার পরেও বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতাদের আশ্চর্য নীরবতা। তাছাড়া পুরসভার নির্বাচনকে দলীয় নেতৃত্ব খুব একটা গুরুত্বও দেয়নি। ফলে তৃণমূল প্রার্থীরা কার্যত ওয়াক ওভার পেয়ে যান।

গূঢ় পুরুষের

কলম

কলকাতা পৌরসভার ১৪৪টি আসনের মধ্যে ১২৫টি আসন তৃণমূল কংগ্রেস জিততে চলেছে বলে দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেছেন। এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তখন ফলাফল সবাই জেনে গেছেন। তবে যে রকম দাপটের সঙ্গে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ভোটে রিগিং করেছে তাতে দলের বিপুল জয় প্রত্যাশিত। আগামী বছর গরমকালে এমনই গরম গরম বিধানসভার নির্বাচন হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মমতাকে ঠেকাতে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উৎসাহিত নয়। বরং বিহারের বিধানসভার নির্বাচনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। লাল পার্টির লাল বাতি টিমটিম করে জ্বলছে। কংগ্রেস সাইনবোর্ড হয়ে গেছে। তাই রাজ্য বিধানসভার ভোটে দিদির জয়জয়কার ঠেকানো যাবে না। সাচ্চা সাংবাদিক এসব কথা প্রতিবেদনে লিখবেন না। এতে বিরোধী দলের কর্মীদের মনোবল কমতে পারে। এই প্রতিবেদক সেই অর্থে সাচ্চা সাংবাদিক নন। যা সত্য তা অস্বীকার না করাটাই একজন কলম লেখকের ধর্ম বলে মানি। সেভাবেই লিখি। রাজ্য বিজেপি নেতারা আমায় ক্ষমা করবেন।

অনেকেই প্রশ্ন করেন সিপিএমের মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৩৪-৩৫ বছর পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল রাজ কায়েম করবেন কীনা? উত্তরটা জানা নেই। সিপিএম পার্টির একটা গঠনতন্ত্র, নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল। পার্টির তোলাবাজরা তাদের আদায়ের ৩০ শতাংশ পার্টি তহবিলে জমা দিত। তৃণমূলের তোলাবাজরা সেদিক থেকে ভাগ্যবান। পার্টির স্থানীয় নেতাদের পকেটে কিছু গুঁজে দিলেই কাজ হয়ে যায়। পার্টি চলে চিটফান্ডের টাকায়। প্রমোটারদের ভরসায়। যদিও দিদি বলেন যে পার্টি চালাতে তিনি ফটাফট ছবি আঁকেন এবং পটাপট সেইসব ছবি বিক্রি হয়ে যায়। তবে কারা সেই ছবি পটাপট কেনেন এবং কত টাকায় এমন বাজে প্রশ্ন দিদিকে করা যাবে না। করলে দিদি তাঁর পোষা পুলিশ লেলিয়ে দেবেন। দিদির রাজনৈতিক ভাগ্যে এখন বৃহস্পতি তুঙ্গে। পুরসভার নির্বাচনের ধামাকায় সারদা আর্থিক কেলেঙ্কারি ধামাচাপা পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় সিবিআই ‘ধীরে চলো’ নীতি নিয়েছে। ঐক্যবদ্ধ জনতা পার্টির নেতা মুলায়ম সিংয়ের আহ্বানকে দিদি তাই পাত্তা দিচ্ছেন না। ∎

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘সমাজতন্ত্র’ ও ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’—বৈধ অথবা অবৈধ ?

বিনয়ভূষণ দাশ

গত ২৬ জানুয়ারি, ২০১৫-র প্রজাতন্ত্র দিবসে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে মূল ভারতীয় সংবিধানের ‘প্রস্তাবনা’র প্রতিলিপি ছাপা হওয়ায় সংবিধানের ‘প্রস্তাবনা’য় ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ ও ‘সমাজতন্ত্র’ শব্দ দুটি না থাকা নিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল থেকে এক তীব্র বিতর্কের বাদানুবাদ চলছে। কেউ শব্দ দুটি না থাকাকে ‘ভুল’ বলছেন, কেউবা ব্যাপারটিকে সরকারের ইচ্ছাকৃত বলে অভিহিত করছেন। বাস্তবে এটি কিন্তু আরো একটি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে; যেটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার আলোচনায় অনুল্লেখিত থেকে গেছে বা যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো, আদি সংবিধানের প্রস্তাবনায় শব্দ দুটি আদৌ কখনও সংযুক্ত হয়েছিল কি? ১৯৭৬ সালে বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জরুরি অবস্থা চলাকালীন শব্দ দুটি সংবিধানের প্রস্তাবনায় যুক্ত হয়েছিল। কোনো ‘নথি’ সংশোধন করতে হলে সংশোধন মূল ‘নথিতে’ করতে হয় এবং ‘প্রাধিকৃত’ স্বাক্ষরকারীদের স্বাক্ষর করতে হয়। ওই বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধন-সহ অন্যান্য কোনো সংশোধনই এভাবে করা হয়েছিল কি? যতদূর জানি, হয়নি। ফলে, সংবিধান সংশোধনগুলি বৈধ কিনা সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন উঠতে পারে। মূল সংবিধানের ‘প্রস্তাবনা’-সহ কোনো অংশেই ‘সংশোধনগুলি করা হয়নি। ২০০০ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রক থেকে প্রকাশিত সংবিধানের মূলের ‘কপিতে’ কোথাও কোনো সংশোধন দেখতে পাইনি। আগের সংশোধনগুলি বৈধ হলে ২০০০ সালে প্রকাশিত সংবিধানের কপিতে অবশ্যই পূর্বোক্ত সংশোধনগুলি থাকা কাম্য ছিল। সংবিধান বিশেষজ্ঞগণ নিশ্চয়ই ব্যাপারটি নিয়ে ভাববেন আশা করা যায়।

সংবিধান প্রণেতারা ‘প্রস্তাবনায়’ ‘সমাজতন্ত্র’ কথাটি রাখেনি। কারণ, সংবিধান প্রণেতাগণ চাননি সংবিধান বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকুক। তাই তাঁরা প্রস্তাবনায় বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অথবা আর্থিক দর্শনসূচক কোনো শব্দ অথবা শব্দাবলী যুক্ত করেননি। যদিও, ‘প্রস্তাবনা’য় সমস্ত নাগরিককে অর্থনৈতিক ন্যায় দেবার কথা বলা হয়েছে “To secure to all its citizens Justice— social, economic and political”।

আর, তাছাড়া বর্তমান বিশ্বে তথাকথিত ‘সমাজতান্ত্রিক’ ভাবধারা তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন ‘সমাজতান্ত্রিক’ দেশের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই। বরং, চর্চার কেন্দ্রে এখন পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কৃত ‘একাত্ম মানবদর্শন।

তথাকথিত বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটিও সংযুক্ত করা হয়েছিল। সংবিধানের ‘প্রস্তাবনার’ মধ্যেই ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ বা তারও থেকে আরও উচ্চতর আদর্শের কথা রয়েছে। রয়েছে ‘সর্বধর্মসমভাবের’ কথা, রয়েছে সব ধর্মমতকে সমান মনে করার কথা। প্রস্তাবনায়

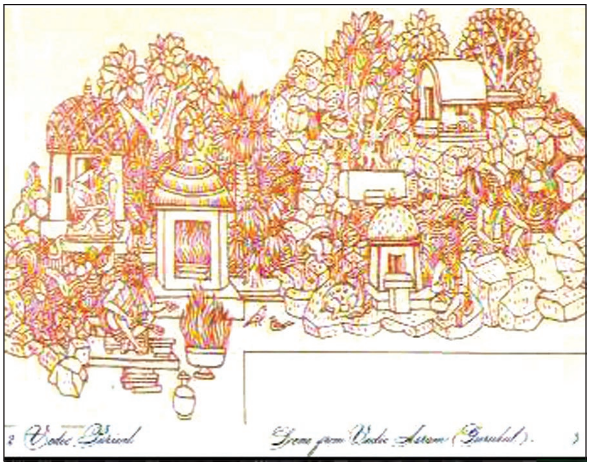

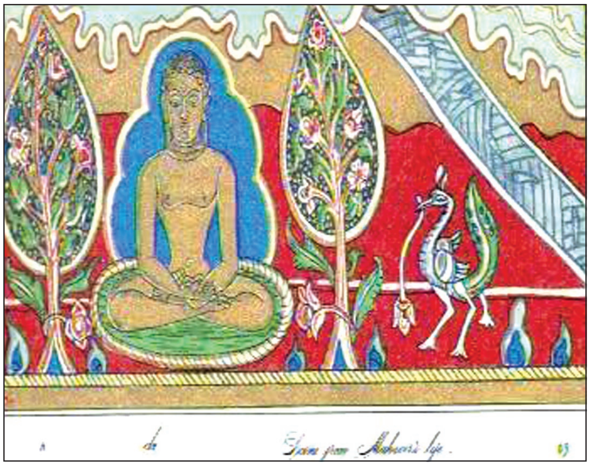

মূল সংবিধানে ব্যবহৃত ছবিগুলিই প্রমাণ করে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি যুক্ত করা বাহুল্যমাত্র।

রয়েছে, "Liberty of thought, expression, belief, faith and worship" এটি ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাণী। সংবিধানের মূল প্রণেতারা তা' জানতেন; তাই তাঁরা আলাদা করে 'সেকুলার' শব্দটি প্রস্তাবনায় রাখেননি। তাঁরা আরও উচ্চতর আদর্শের 'উদ্‌ঘোষ' রেখেছেন প্রস্তাবনায়। তাঁরা জানতেন, ভারতবর্ষ হলো 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'-এর দেশ, এখানে উচ্চারিত হোত 'একম্ সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি।' কারণ, ভারতীয়রা জানেন, 'যাহা আছে তাহা এক; পণ্ডিতেরা বহুভাবে তাহার বর্ণনা করেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাকে বলেছেন, 'যত মত, তত পথ'। তাঁর শিষ্য, জগদ্বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true." (Address at the Parliament of Religions, Chicago, 11th September, 1893)

ভারতীয় আদর্শ ও ঐতিহ্যের অনুসারী মূল সংবিধান প্রণেতারা তাই ঠিকই করেছিলেন— ভারতে এটিই হওয়া উচিত ছিল।

১৯৭৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা স্বৈরতান্ত্রিকভাবে, সংবিধানের 'প্রস্তাবনা'র মূল সুরের বিরুদ্ধে গিয়ে 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দ দুটি ঢুকিয়েছিলেন; যার বৈধতা নিশ্চিত নয়।

সেই সংশোধনে আরও একটি অংশও পরিবর্তিত করা হয়েছিল। 'Unity of the Nation' এর পরিবর্তে করা হয়েছিল 'Unity and integrity of the nation.'

এখন প্রশ্ন হলো, 'প্রস্তাবনা'য় এই সংযোজন ও পরিবর্তন বৈধ কিনা?

প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল (Secretary General) ড. সুভাষ সি. কাশ্যপ-এর মতে, "It has been established that the basic elements or features of the Constitution as Contaised in the Preamble cannot be altered by any amendment under article 368" (Our Constitution– Dr. Subhash C. Kashyap). প্রখ্যাত সংবিধান আইন বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসুও একই মতাবলম্বী।

অতএব, সময় এসেছে সংবিধানের প্রস্তাবনায় প্রক্ষিপ্ত শব্দ দুটি, 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-কে সময়ের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত করবার ও 'প্রস্তাবনা'-কে কলুষমুক্ত করবার।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রণীত গবেষণামূলক অনবদ্য গ্রন্থরাজি—

ইসলামী ধর্মতত্ত্ব : এবার ঘরে ফেরার পালা	- ১৫০.০০	অন্তিম গতি : আল্লার পতিতালয়	- ১০.০০
নির্বাচিত প্রবন্ধ সঙ্কলন (১ম ও ২য় খণ্ড), প্রতিখণ্ড	- ১০০.০০	ইসলামে নারীর স্থান ও পর্দাপ্রথা	- ১৫.০০
মিথ্যার আবরণে দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি	- ৭০.০০	इसलाम के तीन सिद्धान्त	- ১৫.০০
ভারতীয় ইতিহাস শাস্ত্র ও কালক্রম	- ১২.০০	Three Decrees of Islam	- ২০.০০
ভারতীয় ঐতিহ্য ও গান্ধীবাদী অহিংসা	- ১০.০০	Falsehood shrouds the True History of Delhi and Agra	- ১৫০.০০
পুরুষার্থ প্রসঙ্গ পাশ্চাত্য বনাম ভারতীয় ভাবধারা	- ৩৫.০০		
এক নজরে ইসলাম	- ৪০.০০		
বিপথগামী হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর ভবিষ্যত	- ৪.০০		
ইসলামের তিন সিদ্ধান্ত	- ৩.০০		

—: প্রাপ্তিস্থান :—

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

যোগাযোগ : ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫, ৯৪৩৩০৩৩২৬৪

তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা - ৭৩

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বন্দে মাতরম্। বাঙলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হয়ে মা পূর্ব্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান কর্‌লেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হলো। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গোরু, গাল-ভরা হাসি হ'ল। লোকে পরমসুখে বাস কর্‌তে লাগ্‌ল।

এমন সময় মর্ত্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়্‌তে লাগ্‌ল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হলো। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য কর্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাবলেন--- হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়্‌তে হ'ল। তখন বাঙলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; বাঙলায় অনাচার ঘটেছে; আমি বাঙলা ছেড়ে চল্‌লেম। রাজা কেঁদে বল্‌লেন--- না মা, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না; যাতে বাঙলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি করছি। রাজা ঘুম ভেঙ্গে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব'সে পশ্চিমদেশে কনোজে লোক পাঠালেন; কনোজ থেকে পাঁচ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচ জন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাঙালাদেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস করতে লাগল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বস্‌লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। বাঙলার ধন দেখে ধান দেখে মোছলমান বাঙলায় এলেন। তখন বাঙলার রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাঙলার রাজা হ'লেন। হিঁদুর জাতিধর্ম্ম নষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙে মোছলমান মস্‌জিদ্ তুলতে লাগলেন। অর্দ্ধেক হিঁদু মোছলমান হ'ল। হিঁদু-মোছলমানে এক গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস ক'রে মারামারি-কাটাকাটি করতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী ভাব্‌লেন হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাঙলাতে গৌড়ের পাঠান-বাদশা রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হোসেনশা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমার হিঁদুও যেমন, মোছলমানও তেম্‌নি; হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি-কাটাকাটি করতে লাগল, আমি বাঙলা ছেড়ে চল্‌লেম। পাঠান রাজা কেঁদে বললেন— মা, তুমি যেতে পাবে না; আমি হিঁদু-মোছলমান সমান দেখব; তাদের ভাই-ভাই একঠাঁই কর্‌ব; তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না। লক্ষ্মী বল্লেন— আচ্ছা, তাই হবে; আমি এখন থাক্‌ব; দিল্লীতে মোগল বাদশা হবেন। দিল্লীর বাদশা বাঙলার রাজা হবেন; সেই রাজা হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্‌বেন; তখন হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হবে, ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙ্গে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান্য ক'রে রাজমন্ত্রী করলেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায় সিন্নি দিতে লাগ্‌ল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হ'লেন। তিনি যবন ব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লীর মোগল বাদশা বাঙলার রাজা হলেন। তিনি হিঁদু-মোছলমানকে সমান চোখে দেখতে লাগ্‌লেন। হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল, ঝগড়া-বিবাদ মিটে গেল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বস্‌লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হল।

এইরূপে বহুদিন গেল। চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। দিল্লীর তখনকার বাদশা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আলমগির।

তিনি হিঁদু-মোছলমানে তফাত করতে গেলেন। বর্গী এসে বাদশার রাজ্য লুঠ করতে লাগল। সাত সমুদ্র পার হ'য়ে খৃষ্টান ইংরেজ সদাগর বাঙলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল। দিল্লীর বাদশা তাদের আদর ক'রে নিজের রাজ্যমধ্যে জায়গা দিয়েছিলেন। বাঙলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হ'ল। লক্ষ্মী তখন আলমগিরের বংশের দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। বাদশা ইংরেজকে বাঙলার দেওয়ান ক'রে দিলেন। বাদশার দশা দেখে বাদশাকে খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রে তারাই হ'ল বাঙলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হ'য়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হ'ল; কিন্তু রাজ্যে বাস করল না। বাঙলাদেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্রপারে আপন দেশে চল্‌ল। সদাগরের জাত কি না, মেজাজ ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত্ত। তারা চোরডাকাত দমন কর্‌ল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগ্‌ল, আবার নিজের দেশ হ'তে খেলনা এনে, পুতুল এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী যখন চঞ্চল হন, তখন মানুষের বুদ্ধিলোপ হয়। বাঙলার লোকের বুদ্ধিলোপ হ'ল। বুড়ামানুষে শিশু সাজ্‌ল; ইংরেজের দেওয়া খেলনা-পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। সদাগর রাজা কাঁচ এনে দিলেন। বাঙলার প্রজা কাঞ্চনবদলে সেই কাঁচ নিতে লাগ্‌ল। দেশের জিনিষে লোকের মন উঠে না। ঝুঁটোমণির রঙ দেখে দেশের সাচ্চামণিকে অনাদর কর্‌তে লাগ্‌ল। রাজা যত আদর দেন, সোহাগ করেন, দেশের লোক ততই খোকা সাজ্‌তে লাগ্‌ল। রাজা হাততালি দিতে লাগ্‌লেন; দেশের যত বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বল্‌তে লাগল। লক্ষ্মী বল্‌লেন— আর না, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, বাঙলার লোকের এই দশা, আমার আর বাঙলায় থাকা চল্‌লো না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। চঞ্চল হয়ে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে চল্‌লেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠ্‌ল। তখন সাত কোটি বাঙালী কেঁদে উঠ্‌ল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন ব'লে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠ্‌ল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হ'লেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল কেরাণী, হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্‌ত। আলমগির বাদশার তক্তে ব'সে সে আপনাকে আলমগিরের নাতি ঠাওরা'ত। সে বললে, এরা বড় ঘ্যানঘ্যান্ করছে; থাক, এদের দু-দল ক'রে দিচ্ছি; এক দিকে যাক্ মোছলমান, এক দিকে থাক্ হিঁদু। এরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই ক'রে দাও, এদের জোট ভেঙ্গে দাও। এই ব'লে তিনি বাঙালীকে দু-দল ক'রে দিলেন,— এক দিকে গেল হিঁদু, এক দিকে গেল মোছলমান। পূবে-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাক্‌ল হিঁদু।

লক্ষ্মী দেখ্‌লেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আর আমার নিতান্তই বাঙলায় থাকা চল্‌ল না। আমার হিঁদু যেমন, মোছলমান তেম্‌নি। হিঁদু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হ'ল, তখন আর আমার বাঙলায় থাকা চল্‌ল না।

১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সে দিন বড় দুর্দ্দিন, সেই দিন রাজার হুকুমে বাঙলা দু-ভাগ হবে; দু-ভাগ দেখে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাক্‌তে লাগল্— মা, তুমি

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

(২০.৮.১৮৬৪-৬.৬.১৯১৯)

জন্ম জেমোকান্দি--- মুর্শিদাবাদ। পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর। কান্দি ইংরেজী স্কুল থেকে ১৮৮১ খ্রী. এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পান। ১৮৮৬ খ্রী. প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে অনার্সসহ প্রথম স্থান, ১৮৮৭ খ্রী. এম.এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুবর্ণপদক ও পুরস্কারসহ প্রথম স্থান এবং ১৮৮৮ খ্রী. পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরবর্তী দুই বছর প্রেসিডেন্সী কলেজ লেবরেটরীতে বিনা বেতনে বিদ্যাচর্চা করেন। ১৮৯২ খ্রী. রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ও শেষে স্থায়ী অধ্যক্ষ হন। ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'নবজীবন' পত্রিকায় 'মহাশক্তি' নামে প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। পরবর্তী কালে 'সাধনা', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায়ও লিখতেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। বাংলা সাহিত্যজগতে 'সাহিত্য পরিষদের' গুরুত্বের মূলে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ স্মরণীয়। বিভিন্ন সময়ে পরিষদের উন্নতিসাধন করেন। ১৩২০ ব. কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে'র সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞান শাখার সভাপতি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেশকরূপে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি না দেওয়ায় প্রবন্ধ-পাঠ প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিককারী তাঁকে বাংলায় প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি দেন। জাতিভেদপ্রথা-বিরোধী এবং উগ্র স্বদেশপ্রেমী ছিলেন। লর্ড কার্জনের আদেশে বঙ্গভঙ্গের ঘটনার প্রতিবাদে তিনি 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থেরই শেষাংশে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল...' গানটি উদ্ধৃত আছে। ১৯০৫ খ্রী. বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে তাঁর প্রস্তাবে বাঙলাদেশে অরন্ধন পালিত হয়। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ১৪টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্ম-কথা', 'বিচিত্র-প্রসঙ্গ', 'নানাকথা' ও 'জগৎ-কথা'। তাঁর বেদচর্চার ফল ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ এবং 'যজ্ঞকথা' গ্রন্থ। এছাড়াও কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে '**Aids to Natural Philosophy**' বিখ্যাত। অপ্রকাশিত রচনাবলীর সংখ্যাও প্রচুর।

সূত্র : সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান।

বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর; বিদেশী রাজা আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন না; তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই কর্‌তে চাইলেন; আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না; মা, তুমি কৃপা কর; আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব; আর পুতুলখেলা কর্‌ব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিন্‌ব না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌ব না; মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া কর্‌লেন। কালীঘাটের মা-কালীতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মা-কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সে দিন আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্য্যোগ। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, হুহু ক'রে হাওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙালী মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়্‌ল। বল্‌লে, মা, আমাদের রক্ষা কর। বাঙলার লক্ষ্মী যেন বাঙলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেল্‌ব না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাক্‌তে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা ব'লে উঠ্‌লেন— জয় হউক, জয় হউক; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন; বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাক্‌বেন; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না; ঘরের থাক্‌তে পরের নিয়ো না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না; তোমাদের ''এক দেশ এক ভগবান্, এক জাতি এক মনপ্রাণ'' হোক্; লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐ দিন বাঙলা ছাড়্‌ছিলেন। ঐ দিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হ'লেন। বাঙলার হাট-মাঠ-ঘাট জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌ল। তাতে রাজহংস খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল।

বাঙলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সে দিন উনুন জ্ব্‌ল্‌ল না। হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখী বাঁধ্‌লে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

বচ্ছর-বচ্ছর ঐ দিনে বাঙালীর মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে ঐ দিন উনুন জ্ব্‌ল্‌বে না। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখী বাঁধ্‌বে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম ক'রে বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাক্‌বেন।

সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই।।
ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই।।
ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই।।

মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পর্‌বো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌বো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুল্‌বো না। মোটা অন্ন ভোজন কর্‌বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ কর্‌বো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন।

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার হাওয়া* বাঙলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্।

বাঙলার ঘর, বাঙলার মাঠ,
বাঙলার বন, বাঙলার হাট,
পুর্ণ হউক, পুর্ণ হউক,
পুর্ণ হউক, হে ভগবান্।

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান্।
বন্দে মাতরম্।

*'বঙ্গদর্শন'-এর পাঠ

অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গ লক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সে দিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিঁড়ামুড়ি অথবা পূর্ব্বদিনের রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দুর লইবেন। হরীতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথাশেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম্ম আরম্ভের পূর্ব্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন। *প্রকাশ : এপ্রিল, ১৯০৬*

রবীন্দ্রনাথ-রামেন্দ্রসুন্দর
দেশপ্রেম-সঞ্জাত একটি সম্পর্কের রসায়ন

অর্ণব নাগ

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে এহেন দিন কখনও আসেনি আর ভবিষ্যতে কোনোদিন আসবেও না। ১৯১৯ সালের ৬ জুন। শেষ শয্যায় শায়িত সাহিত্যে বিজ্ঞান-চর্চার জনক— না তাঁর পরিচয়টা বোধহয় ভুলই বলা হলো। যিনি কলকাতা

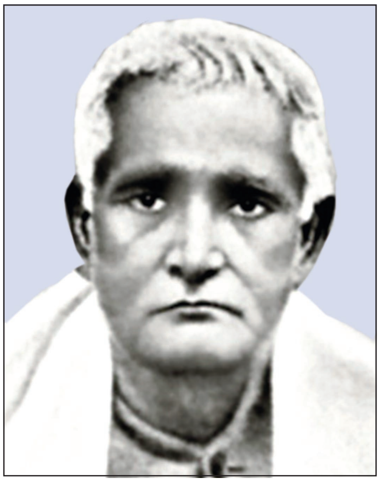

রামেন্দ্রসুন্দর

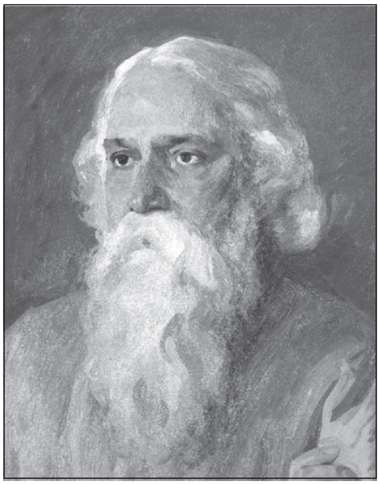

রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক হিসেবে বঙ্গভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ করতে চাইলে, বিশ্ববিদ্যালয় তাতে অনুমতি না দেওয়ায় সরাসরি প্রবন্ধ পাঠ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন তাঁর অন্তরে যে জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের প্রদীপ চিরজাজ্বল্যমান থাকবে এটা বোঝার জন্য জ্যোতিষী হওয়ার দরকার পড়ে না। পরে অবশ্য উপাচার্য স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তাঁকে সেই অনুমতি দেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় যাঁর স্বাদেশিকতা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে চির-শিক্ষণীয় হয়ে রয়েছে। যে কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল... মাত্র ৫৫ বছর বয়সে তিনি শেষ শয্যায় শায়িত। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের রেশ তখন বিলীয়মান। গোটা সেইসময় ফুঁসছে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইট' উপাধি বর্জন করে স্বদেশপ্রেমের নিরুচ্চার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। দিন দু'য়েক আগে গুরুদেবের পদত্যাগ পত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে বেরোয়। অন্তিম-শয্যাতেও তা দেখেছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। ইচ্ছে ছিল রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নেওয়ার। কর্মসুহৃদ্ রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধ রক্ষা করতে ওইদিন এসেছিলেন কবিগুরু। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে পড়ে শোনালেন তাঁর 'নাইট' উপাধি ত্যাগের মূল চিঠিটি। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভাষায় : 'এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ।' রামেন্দ্রসুন্দরের শেষ ইচ্ছে পূর্ণ হলো। রবীন্দ্রনাথের পদধূলি তাঁর মস্তকে ঠেকল। পরমসুখে চিরনিদ্রায় গেলেন তিনি।

রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দর সম্পর্কের একাধিক খতিয়ান থাকতেই পারে। কিন্তু এঁদের বন্ধন-কে এক ফ্রেমে ধরে রাখতে এর চেয়ে মর্মস্পর্শী ছবি কি কোনো অতি কল্পনাপ্রবণ চিত্রকরের মাথা থেকেও বেরোবে? এঁদের সুসম্পর্কের নানা আঙ্গিক আলোচিত হতেই পারে। কিন্তু 'স্বস্তিকা'র পত্রিকাগত চরিত্র মেনে আমরা আপাতত স্বাজাত্যবোধের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-রামেন্দ্রসুন্দরের পারস্পরিক ও পারম্পরিক সম্পর্কে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করছি। এঁদের এহেন সম্পর্কের সূত্রপাত মূলত বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৩-১৯১১)-কে কেন্দ্র করে। বাংলা প্রদেশ ও সমস্ত বাঙালি-কে একসূত্রে গাঁথতে রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০ আশ্বিন (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫) রাখি বন্ধনের প্রস্তাব করেন। তিনি নিজে ওইদিন পথে নেমে সবাই-কে হলুদ সুতোর রাখি পরিয়ে দেন। এই উপলক্ষে তিনি 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি রচনাও করেন। ওই বিশেষ দিনেই রামেন্দ্রসুন্দরের প্রস্তাবানুযায়ী বাংলার ঘরে ঘরে অরন্ধন পালিত হয়। শুধু তাই নয়, বিষয়টি প্রত্যেক বাঙালির ঘরে পৌঁছে দিতে রামেন্দ্রসুন্দর রচনা করেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (স্বস্তিকা-র এই বিশেষ সংখ্যায় তা পুনর্মুদ্রিত)।

এর শেষাংশে গুরুদেবের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি উদ্ধৃতও করেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৬ মাঘ যে সংবর্ধনা-পত্রটি পাঠ করেন তাতে উল্লেখ ছিল : 'কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন

করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল।' ব্যক্তিগত আখ্যান কখনও কখনও এভাবে জাতীয়তাবোধেও সামিল হয়। সশস্ত্র চরমপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে কখনোই সেভাবে আকৃষ্ট করতে পারেনি। দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই ছিল তাঁর দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। অথচ এই দেশের কিছু মানুষের হাতে তিনি কম লাঞ্ছিত হননি। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তা পালনে উদ্যোগী হলে কিছু লোকের বাধার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। বিষয়টি রবীন্দ্রনাথকে যে কতটা ব্যথিত করেছিল রামেন্দ্রসুন্দর-কে লেখা দু'টি পত্রে সে প্রমাণ রয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের দেশপ্রেম কিন্তু গুরুদেবের মনোযোগকে আকর্ষণ করতে পেরেছিল। আশুতোষ বাজপেয়ী রচিত 'রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা' গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন : 'দেশের প্রতি তাঁহার প্রীতির মধ্যেও তাঁহার নিজের বিশিষ্টতা ছিল; তাহা স্কুলপাঠ্য বিলাতী ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত তৎকালীন কন্‌গ্রেস তোতাপাখী কর্তৃক উচ্চারিত বাঁধাবুলির দ্বারা পুষ্ট ছিল না। তাঁহার চিত্তের মধ্যে ভারতের একটি মানসী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মূর্তিটি ভারতেরই সনাতন বাণীর উপকরণে নির্মিত। সেই বাণীর সহিত তাঁহার নিজের ধ্যান নিজের মনন সম্মিলিত ছিল। তাঁহার সেই স্বদেশপ্রীতির মধ্যে ব্রাহ্মণের জ্ঞানগাম্ভীর্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজস্বিতা একত্র সংহত হইয়াছিল।' উভয়ের দেশপ্রেমের মিলন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন পর্বে হলেও এবিষয়ে তাকেই চূড়ান্ত মাপকাঠি বলা চলে না। ওই আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর কী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তার কিছু কিছু আগেই উল্লেখ করেছি। এছাড়াও এক্ষেত্রে এঁদের সংযোগের আরও কিছু উদাহরণ হাতের কাছেই মজুত রয়েছে। যেমন ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৭ ফাল্গুন

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

জেনারেল অ্যাসেম্বলি হল-এ বঙ্গভঙ্গ ঠেকাতে রবীন্দ্রনাথ পড়েন 'সফলতার সদুপায়'। (দ্র. 'প্রবাসী', আশ্বিন, ১৩১৪)। সেই সভায় রামেন্দ্রসুন্দর সভাপতিত্ব করেন। অন্যদিকে কবিগুরুর প্রস্তাব অনুযায়ী কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ১৭ ও ১৮ কার্তিক 'সমস্ত বাঙালি-কে যথাসম্ভব জাগাইয়া তুলতে' বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রামেন্দ্রসুন্দর পড়েন তাঁর 'মাতৃমন্দির' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি। রবীন্দ্রনাথ এর সভাপতি ছিলেন।

অবশ্য বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার প্রেক্ষাপটে দু'জনের যে মতপার্থক্য হয়নি তাও নয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ব্যাধি ও প্রতিকার' (প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩১৪)-এ প্রদর্শিত তাঁর রাজনৈতিক মত ও পথের সঙ্গে একমত হতে পারেননি রামেন্দ্রসুন্দর (দ্রষ্টব্য : প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৪, 'ব্যাধি ও প্রতিকার', রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী)। আসলে এই আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথ সহমর্মী ছিলেন। কিন্তু যেদিন 'স্বদেশী' ও 'বয়কট'-এর নামে দেশের ব্যবসায়ীদের কাছে একপ্রকার জুলুম চালু করল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সেইদিনই মানসিকভাবে এই আন্দোলন থেকে সরে আসেন রবীন্দ্রনাথ। কারুর ওপর কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার তীব্র বিরোধীই ছিলেন তিনি। পাশ্চাত্য কেরানি তৈরির শিক্ষানীতিরও তিনি আজীবন বিরোধী ছিলেন। বোলপুরে ১৯০১ সালে তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিল এই প্রচলিত শিক্ষারীতি থেকে বেরোনোর প্রয়াস। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ অক্টোবর ফিল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমি ক্লাবের মাঠে আয়োজিত এক সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ওই বছরেরই ৮ নভেম্বর রংপুরে। কিন্তু সেইসময় প্রবল স্বদেশিয়ানার উচ্ছ্বাসে আবেগের আতিশয্যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার পক্ষপাতী ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। আর এখানেই তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে মতে মিলত না তাঁর। কিন্তু এই কর্ম থেকে পিছিয়ে আসার কোনো মনোবাসনাও তাঁর ছিল না। নিজের ক্ষমতার ওপর চিরদিনই আস্থাভাজন ছিলেন তিনি।

রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে তাঁর মত ও পথ অনেকাংশে মিলে যেত বলেই তিনি অকপটে ১৯০৫ সালের ১২ ডিসেম্বর এক পত্রে রামেন্দ্রবাবুকে লিখতে পেরেছিলেন : 'ইহা নিশ্চয়ই জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া

মনে করেন— যাঁহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনাকে এই স্পর্দ্ধা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান করেন তাঁহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্থায়ী মঙ্গলসাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্তমানকালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইহাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্তব্য নিভৃতে যথাসাধ্য নিজের কাজে মনোযোগ করা। বৃথা চেষ্টায় নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অন্যায় হইবে।

বিশেষত উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। তাই আমি ঠিক করিয়াছি যে, অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে আমার এই প্রদীপটি জ্বালিয়া পথের ধরে বসিয়া থাকিব।'

প্রদীপ তিনি জ্বেলেছিলেন। যে রবি-কিরণে জগৎ-সংসার উদ্ভাসিত হলো। তিনি পথের ধারেই বসলেন, তবে বিশ্বপথিক হয়ে। সুইডিশ কমিটি রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করল নোবেল পুরস্কারে। কলকাতায় খবর পৌঁছল ১৯১৩ সালের ১৪ নভেম্বর। ওইদিন বিকেলেই শান্তিনিকেতনে এ খবর পান তিনি। ঠিক তার দু'দিন বাদে কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ১৬ নভেম্বর কলকাতার পার্সীবাগান লেন থেকে তাঁকে একটি অনন্যসাধারণ পত্র লেখেন রামেন্দ্রসুন্দর। পত্রটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অন্য জায়গায়। শুধু বিপ্লবী আন্দোলন কিংবা কংগ্রেসী ঘরানায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই যে দেশপ্রেমের একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরাকাষ্ঠা নয়, রবীন্দ্রনাথের মতোই একথা অনুভব করতেন রামেন্দ্রসুন্দর। তাই কবির নোবেল জয় তাঁর কাছে দেশপ্রেমোত্তম সম্পদ রূপেই পরিগণিত হয়েছিল। এই প্রাপ্তি যে পরাধীন ভারতবর্ষকে বিনা রক্তপাতে, সহিষ্ণুতার মন্ত্র থেকে বিচ্যুত না করে দেশকে স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছিল প্রখর দেশপ্রেমিক রামেন্দ্রসুন্দরের ধ্যাননেত্রে তা ধরা পড়েছিল।

ওই পত্রে আবেগ উচ্ছ্বসিত ভাষায় রামেন্দ্রসুন্দর লেখেন : 'স্বদেশের বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহার নিজেকে চিনিবার সম্পূর্ণ শক্তি নাই; যে শক্তিটুকু আছে, তাহার সম্যক প্রকাশেরও ক্ষমতা নাই। কালি যদি আমার দেশ গলা খুলিয়া বলিয়া যাইত, আমার এই ভাঙা ঘরের দেওয়ালের ভিতর এমন প্রদীপ গুপ্ত আছে, যাহা জগতে আলো দিতে পারে, তাহা হইলে আমার দেশকে কিরূপ বিদ্রূপ ও অপমান সহিতে হইত, তাহা অনুমান করিতে পারি। কিন্তু আজি যখন সেই জীর্ণ প্রাচীর ভিন্ন করিয়া স্বয়ংপ্রকাশ রবিংজ্যোতি আপনা হইতে জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সেই আলোতে সেই ভাঙা ঘরও প্রকাশ পাইয়াছে আজ সেই কুটীরবাসীদের আনন্দ প্রকাশের অবসর উপস্থিত। আজি আমরা অকুণ্ঠিতভাবে জয়ধ্বনি দিব। আপনার জয় নহে— আপনি যন্ত্রমাত্র— আমাকে দিয়া বিধাতা এতকালের এই অবমানিত জাতিকে জগতে প্রতিষ্ঠা দিলেন।'

রামেন্দ্রসুন্দর যেমন রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছরের জন্মদিন পালনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তেমনই তার বছর তিনেকের মধ্যে তাঁর বয়সেরও পঞ্চাশ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আয়োজিত সংবর্ধনা-সভায় যোগ দিতে দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজকে নিয়ে কবি স্বয়ং এসে পড়েন বোলপুর থেকে। রামেন্দ্রসুন্দরকে চন্দন পরিয়ে স্বরচিত ও নিজের হাতে লেখা এক অভিনন্দন পত্রে তাঁর স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।'

রবীন্দ্রনাথের মতো দীর্ঘ জীবন রামেন্দ্রসুন্দর পাননি। দেখে যেতে পারেননি গত শতাব্দীর বিশের দশক থেকে শুরু হওয়া উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলন। আর দেশের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ভ্রান্ত মত ও পথ। স্বাধীনতার পথে আমরা যত এগিয়েছি রামেন্দ্রসুন্দরের স্বদেশহিতৈষণাকে না পাওয়ার অভাব ততই যেন প্রকট হয়েছে। শুধু একটাই সান্ত্বনা, রবীন্দ্রনাথকে যেভাবে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এবং অদূরদর্শী নাগরিকদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে, অকালপ্রয়াণের ফলে রামেন্দ্র সুন্দরকে অন্তত সেই অপমানের গ্লানি সইতে হয়নি।

কৃতজ্ঞতা :

রবীন্দ্রনাথকে লেখা রামেন্দ্রসুন্দরের ও রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রগুলি পাওয়া গিয়েছে বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'চিঠিপত্র পঞ্চদশ খণ্ড' থেকে। কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্যাদিও এখান থেকে পাওয়া। এছাড়া আশুতোষ বাজপেয়ীর 'রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা', সাহিত্য-সাধক চরিতমালা (৭০ সংখ্যক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)-র অন্তর্গত 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী'-র জীবনী, রামেন্দ্রসুন্দরের 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' (সূত্রধর সং, ২০১৫, অলোক রায়ের ভূমিকা সহ), অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া এবং প্রবাসী' (১৩১৪ব.), 'সাহিত্য' (১৩২৬ব.) প্রভৃতি গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

চিঠিপত্র

পুরভোটে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ

নিজের ভোটদান স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করবে, এটাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। আর তাকেই বলে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন। গত ১৮ এপ্রিল কলকাতার পুরভোট নির্বাচনকে অবাধ নির্বাচন, সুষ্ঠু নির্বাচন, স্বাধীন মত প্রকাশের নির্বাচন বলা যাবে না। কেননা ভোট দিতে গিয়ে ভোটাধিকারে বাধা, রীতিমতো প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হলো। কোনো একজনের অঙ্গুলিহেলনে এই সমস্ত কুকর্ম হচ্ছিল তা পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল। শুধু আমার নিজের ক্ষেত্রে নয়, আমার পাশাপাশি আরো অনেকের ক্ষেত্রে একইরকম ঘটনা ঘটলো।

২৭/১ বি, বিধান সরণি কলকাতা-৬ এ বসবাস করি। গত লোকসভা নির্বাচনেও ভোট দিয়েছি, কিন্তু এইরকম ভাবে বাধাপ্রাপ্ত কোনোদিন হতে হয়নি। আমার ভোটকেন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজ। ৯নং পার্টে ৪৭১ নং সিরিয়ালে আমার নাম। সকাল সাতটার সময় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার মতো অনেকেই লাইন দিয়ে আছেন। ঠিক সময়ে ১, ৭, ১০ নং ৮ নং পার্টে যথারীতি ভোট দান চালু হয়ে গেল। শোনা গেল আমাদের ৯ পার্টের ই.ভি.এম খারাপ। হতেই পারে যান্ত্রিক গোলযোগ। দ্বিতীয় ই.ভি.এম এল। সেটাও খারাপ শোনামাত্রই লাইনে দাঁড়ানো সবাই অধৈর্য হয়ে উঠলেন। কেউ বা রেগেমেগে ভোট দান না করেই চলে গেলেন। যাই হোক, ৮ টার সময় ঝামেলা হবে বুঝতে পেরে ই.ভি.এম চালু হলো।

আমার আগে ২৬ নং বিধান সরণিতে থাকেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক বিদ্যুৎ মুখার্জী, ২৭ নম্বরে স্বস্তিকার সহ-সম্পাদক সুকেশ মণ্ডল, তারও তিনজনের পর ২৬ নং-এর অরবিন্দ দাশ ও আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। বিদ্যুৎবাবুকে বলা হলো নাম কাটা আছে, ভোট দেওয়া যাবে না। তিনি বললেন ভোট দেওয়া যাবে না মানে? ভোট দিয়েই যাবো, বলে জোর করতেই তাঁকে ভোট দিতে দেওয়া হলো। সুকেশ মণ্ডলকেও ভোট দিতে বাধা দেওয়া হলো। সুকেশবাবু নিজেকে প্রেসের লোক বলাতেই ভোট দিতে দেওয়া হলো। আমার যখন পালা এল তখন আমাকে বলা হলো— আপনার নামটি ইনকোয়ারির লোক কেটে দিয়েছেন, আপনি ভোট দিতে পারবেন না। প্রিসাইডিং অফিসার বললেন— 'আমার করার কিছু নেই। এটা এনকোয়ারির লোক করেছেন।' আমি তখনকার মতো বেরিয়ে চলে এলাম। আমাকে বাইরের একজন বললেন, পুরো বৈজ্ঞানিক রিগিং চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস জেনেশুনে আপনাদের নামগুলি ওই এক ঘণ্টার মধ্যে অর্থাৎ ইভিএম খারাপের সময় কাটাকাটি করেছে। কেন ভোট দিতে পারবেন না— আপনার বিরুদ্ধে কোনো এলিগেশন থাকলে ৬ মাস আগেই আপনি জানতে পারতেন। আপনি দ্বিতীয়বার গিয়ে চ্যালেঞ্জ জানান।

আমি যথারীতি দ্বিতীয়বার লাইন দিয়ে দাঁড়ালাম। আমার নাম দেখে অফিসাররা বললেন, আপনার নামটি বাদ পড়েছে। আমি বললাম— ভোট দেবো বলে দাঁড়িয়েছি। চ্যালেঞ্জ জানানোর ফর্মটি আমাকে দিন, আমি চ্যালেঞ্জ জানাবো। না হলে আমাকে ভোট দিতে দিন। যেই না বলা প্রিসাইডিং অফিসার বললেন, ভোট আপনি দিয়ে যান। আমি ভোট দিয়ে বললাম এই রকম কতজনকে করলেন? আপনারা নির্বাচন কমিশনের লোক, না তৃণমূলের লোক? একতরফা ভোট করাবেন বুঝি, এটা চলতে দেওয়া যাবে না। আমি চিৎকার করে বললাম, বৈজ্ঞানিক রিগিং চলছে, সবাই সাবধান হোন। ভোট দিতে না দিলে চ্যালেঞ্জ করুন।

—**জয়রাম মণ্ডল,**
কলকাতা-৬।

স্বদেশের স্বার্থে লড়াই

সমাজ সৃষ্টির প্রথম থেকেই কিছু লোভী মানুষ বা গোষ্ঠীর এবং পরবর্তীতে শক্তিশালী দেশগুলির দুর্বল দেশগুলির উপর আধিপত্য ও শোষণ হয়ে এসেছে। দাসপ্রথা, উপনিবেশিকতা, ঠাণ্ডাযুদ্ধ অতিক্রান্ত। পৃথিবীতে এখন শোষণ চলছে মূলত অর্থনৈতিক মানদণ্ডে। সবচেয়ে ভয়ানক ছোট, মাঝারি, উন্নয়নশীল দেশ বা গোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ক্রমবিলীয়মান হচ্ছে, মূলত ভোগবিলাসী, দূষণ সৃষ্টিকারী পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে।

ভারতের মতো সুপ্রাচীন সনাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও ঘটছে স্থূলরুচির অন্ধ সামাজিক অনুকরণ। এই নব্য 'Cultural Imperialism' রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের নয়া সংস্করণ, যা অজান্তে আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলেছে।

জাঙ্ক ফুড, টিভি সিরিয়াল, অপ্রয়োজনীয় কার্টুন, রিয়েলিটি শো-র মাধ্যমে বিশেষত বাচ্চাদের, নবীন প্রজন্মকে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ভারতের শৈশবকে obesity (স্থূলতা), Child Heart dizease, depresasion, disorder প্রভৃতি রোগের আঁতুড়ঘর করে তুলছে। আমরা জেনেশুনে বিষ পান করছি। শিশুদের দরকার মমতা, স্নেহ। আমরা দিচ্ছি স্নেহপদার্থ, কুড়কুড়ে, লেজ, যাতে Azinomotto রয়েছে যা অত্যন্ত ক্ষতিকারক কেমিক্যাল সংমিশ্রিত।

প্রতিদিন আমরা যা বাজার থেকে কিনছি--- তার অধিকাংশই বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার তৈরি। অথচ জাতীয় স্তরে সেগুলির বহু কোম্পানি, সরকারি অথবা বেসরকারি সংস্থা রয়েছে যারা প্রায় একই ধরনের, হয়তো বা আরও উচ্চশ্রেণীর সামগ্রী বাজারজাত করেছে। কিন্তু প্রচারসর্বস্ব মিডিয়া এবং ব্র্যান্ড নেমের কাঙাল, আমরা অজান্তেই আমাদের গাঁটের অতিরিক্ত কড়ি দিয়ে বহুজাতিক প্রোডাক্ট কিনছি। কিন্তু এর

বদলে অনায়াসেই কমমূল্যের দেশীয় প্রেডাক্ট কিনতে পারি, যা অধিক পুষ্টিকর ও অর্থসাশ্রয়ী।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি আমরা বিদেশি দ্রব্য বর্জন করব? উত্তর অবশ্যই না। বিদেশি দ্রব্য আমরা সেগুলিই কিনব যা অত্যাবশ্যকীয়— যেমন বাড়ির কোনো Heart Patient অসুস্থ হওয়ায় Pace-maker দরকার অথবা বিদেশি জীবনদায়ী ওষুধ প্রভৃতি। বিশ্বায়নের যুগে শুধু স্বদেশীই ব্যবহার করব— এ কথা ভাবা মুখার্মি। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আমরা অবশ্যই 'আপেক্ষিক মনোনয়ন' (chossy relatively) হতে পারি, যা একাধারে স্বদেশী কোম্পানিগুলির কুক্ষিগত হয়ে বাইরে চালান বন্ধ হবে। লাভ হবে দেশের অর্থনীতির, জনসাধারণের।

LICI, AICI, Nationalised Bank-এর সঙ্গে যখন বিদেশি বীমা-সংস্থা, বিদেশি ব্যাঙ্কের তুলনা করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রথম আপত্তি থাকে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও দ্বিতীয়ত লভ্যাংশের স্থানান্তর। একথা সত্য, সকল স্বদেশী কোম্পানিগুলি সামাজিক দায়বদ্ধতা (Social Responsibility) সেভাবে পালন করে না। তথাপি সম্পদ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে বেশি নির্ভরযোগ্য।

আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে একথা বুঝেছিলেন ভারতের বেশ কিছু চিন্তাবিদ, দার্শনিক, মনীষী--- প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, মেঘনাদ সাহা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যাঁরা স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রয়োগ নিজেদের জীবনে করে গেছেন এবং করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্বদেশী সামগ্রী কেনার ক্ষেত্রে এই নতুন লড়াইয়ে সামিল হতে পারেন— যে লড়াই বিপণির মধ্যে কেনাকাটার সময়, নিজের সঙ্গে ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে।

'Brand নেব বেশি দাম দিয়ে' না 'প্রয়োজনীয় জিনিসটি নেব শুধু প্রয়োজনীয়তা (Utility Aspect)' মাথায় রেখে, অকারণ লোকদেখানো আদিখ্যেতাকে বাদ দিয়ে। বড়ো কঠিন এ লড়াই। কিন্তু এ লড়াই আমাদের জিততেই হবে— 'আমার ভারতের স্বার্থে— Make in India & Made in India.'

—সুদীপ্ত বসাক,
সম্পাদক, বি.এম.এস. মুর্শিদাবাদ।

ঘর বাপসি

সম্প্রতিকালে ঘর বাপসি অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরে আসা নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে অনেক লেখালেখি হয়েছে। সেসব পড়ে আমায় মানে করিয়ে দিয়েছে প্রাচীন কবি কালিদাসের প্রথম জীবনের কাহিনি। তিনি গাছের যে ডালে বসেছিলেন তারই গোড়ার দিকে কাটছিলেন। তার এই সামান্য বোধটুকু ছিল না যে গোড়ার দিকে কাটলে তিনি নিজেই পড়ে যাবেন। কিন্তু হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরে আসার ব্যাপারে যে সব লেখালেখি হয়েছে তা পড়ে আমার মনে হয়েছে যে হিন্দুরা যে বিশাল বট গাছের ছায়ায় রয়েছে, সবাই মিলে তারই মূল উৎপাটনের কাজ করে চলেছে। যেন মনে হচ্ছে মুসলমানরা হিন্দুদের মুসলমান করতে পারবে, খৃষ্টানরা হিন্দুদের খৃষ্টান করতে পারবে। অপর পক্ষে হিন্দুরা মুসলমান ও খৃষ্টানদের হিন্দু করা তো দূরের কথা ধর্মান্তরিত হিন্দুরা যদি স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করে তবে গেল গেল রব পড়ে যায়। ওইসব লেখা থেকে প্রাচীন এক কুযুক্তি মনে পড়ে যায় সেটা হলো দুধ থেকে ছানা বা দই করলে তাকে কী দুধে আনা যায়? অর্থাৎ একবার হিন্দু থেকে অন্য ধর্মে গেলে তাকে আর হিন্দু ধর্মে নেওয়া যাবে না। ইতিহাস সাক্ষী, বিগত প্রায় ১২০০ বছরের বিদেশি আক্রমণ, আমাদের পরাধীনতা ও ব্যাপক ভাবে হিন্দুদের ধর্ম পরিবর্তন করানোর ফলে হিন্দুরা কেবল বিশাল জনসংখ্যাই হারায়নি তাদেরকে হারাতে হয়েছে বিশাল ভূখণ্ড যা আজ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামে পরিচিত স্বাধীন দেশ। ধর্মান্তরিত হিন্দুরাই (মুসলমান) ওই দুটি দেশ গঠনের মূলে। ধর্ম পরিবর্তনের ফলে আজ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজ কারবার মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অসম ও কাশ্মীর তার জ্বলন্ত উদাহরণ। এই বিষয়ে একটি কথা বলে রাখা দরকার তা হলো হিন্দুরা কারোর ধর্ম পরিবর্তনের বিরোধী। স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম পরিবর্তনের খুব বিরোধী ছিলেন কিন্তু স্বধর্মে ফিরে আসার নয়।

স্বামীজী ১৮৯৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আমেরিকার আর্ট ইনস্টিটিউট-এর কলম্বাস হলে একটি সক্ষিপ্ত ভাষণে বলেছিলেন যে ভারতে ধর্ম যথেষ্ট আছে। ভারতের সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য। এর পরও অনেক বছর ধরে খৃষ্টানরা ধর্ম পরিবর্তনের কাজ করে চলেছে সেবার আড়ালে। স্বামীজী ধর্ম পরিবর্তনের কত বিরোধী ছিলেন তা একটা উদাহরণ থেকে খুব ভালো বোঝা যাবে। স্বামীজী দেশে ফেরার পর একদিন প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন--- আচ্ছা সিংহ, কেউ যদি তোমার মাকে অপমান করে তখন তুমি কি করবে? প্রিয়নাথবাবু উত্তর দিলেন, 'মশায় ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে উত্তম শিক্ষা দেব'। বেশ কথা! যদি তোমার ধর্মের প্রতি ঠিক সেরকম অচলা ভক্তি থাকত তাহলে তুমি কখনো একটিও হিন্দুর ছেলেকে খৃষ্টান হতে দেখতে পারতে না। কিন্তু দেখ, রোজ এ ঘটনা ঘটছে। (সবার স্বামীজী— Rankrishna Mission Institute of Culture).

—সমর কুমার বসু,
চাকদা, নদীয়া।

সবার প্রিয় ®
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

বেদে গণিতের অস্তিত্ব

দীননাথ বত্রা

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রথম পরিচয় পাই আমরা বেদের মধ্যে। গণিতের বহু বিষয় বেদে উল্লেখ আছে। বেদের মধ্যে বীজরূপে পাওয়া গণিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু বিষয় আমাদের উপহার দিয়েছে।

যজুর্বেদে বলা হয়েছে— 'ওঁ খং ব্রহ্ম'। ওঁ এবং খং ব্রহ্মের দুটি নাম। খং-য়ের অর্থ আকাশ অথবা শূন্য। নারদপুরাণের দ্বিতীয় চরণের ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষের বর্ণনা প্রসঙ্গে শূন্যের

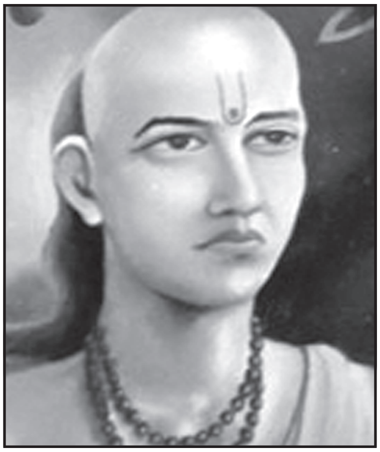

আর্যভট্ট

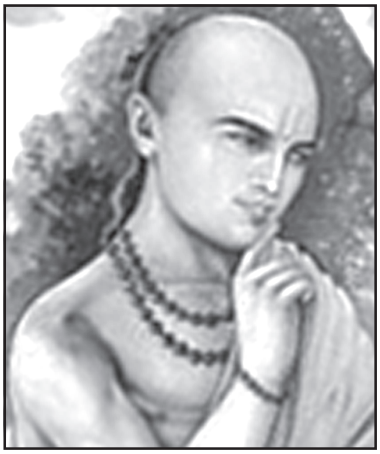

ভাস্করাচার্য

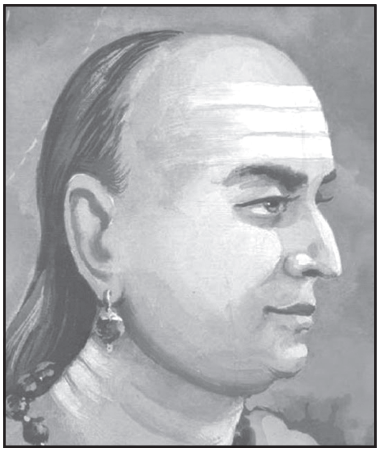

বরাহমিহির

ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে শূন্যের বর্গ বা ঘন অথবা বর্গমূল বা ঘনমূল করলে তা সব সময় শূন্যই হয়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় ভাস্কারাচার্য তাঁর লীলাবতী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে একথাই বলেছেন, 'কোনো রাশির সঙ্গে শূন্যযুক্ত করলে ওই রাশিই পাওয়া যায়। শূন্যের বর্গ, ঘন, বর্গমূল ও ঘনমূল শূন্যই হয়ে থাকে।'

ভারতে শূন্যের আবিষ্কার সম্পর্কে Albert Einsten তাঁর টীকায় লিখেছেন, "We owe a lot to Bharat who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made."

অথর্ববেদে বেদে সংখ্যার বর্ণনা এরকম :

ন দ্বিতীয়ো, ন তৃতীয়ো,
ন চতুর্থী, ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ।
সপ্তমো নাপ্যচ্যতে নাষ্টমো
ন নবমো দশমো নাপ্যচ্যতে।।
তমিদ নিগতং সহঃ সব এষ এক এব বৃদেক এব।
সর্বে অস্মিন্ দেবা এক বৃতো ভবন্তি।।

অর্থাৎ পরম পিতা পরমাত্মা একই। তিনি সর্বদা এক, অদ্বিতীয় এবং অপ্রমেয়। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নেই। যজুর্বেদে বলা হয়েছে, অঙ্ক পরস্পর মিলে সংখ্যা নির্মাণ করে। যেমন, এক এবং দুই মিলে তিন হয়। সে রকম পাঁচ, সাত, নয়, এগার, তেরো, পনের, সতের, উনিশ, একুশ...তেত্রিশ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে। আর একটি ঋকে চার থেকে আট এবং আটচল্লিশ পর্যন্ত উল্লেখ আছে। সংখ্যার প্রত্যেক রাশির স্থানানুসার বিশেষ মানও হয়ে থাকে। যজুর্বেদে বলা হয়েছে :

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎপূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্যপূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

অর্থাৎ এটা পূর্ণ, ওটা পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণ বলা হয়। পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলেও পূর্ণই থেকে যায়।

গণিতকে সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি বলা হয়েছে :

যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণোয়ো যথা।
তদ্বৎ বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং গণিত মূর্ধন্য বর্ততে।।

গণিতের আক্ষরিক অর্থ হলো, যে শাস্ত্রে গণনা প্রধান বিষয় রূপে থাকে। এই শব্দ বৈদিক সাহিত্যে নানাভাবে পাওয়া যায়। গণিতের উৎপত্তি মূলত যজ্ঞবেদি নির্মাণ ও নক্ষত্র গণনার প্রয়োজন থেকেই হয়েছে। পৌরাণিক কালে পাটি অর্থাৎ মেঝেতে খড়ি দিয়ে অথবা মেঝেতে ধুলোর ওপর কোনো কাঠি দিয়ে আঁক কষে গণনা করা হোত। সেজন্য একে পাটিগণিত বা ধূলিকর্ম নামেও অভিহিত করা হোত।

দেবর্ষি নারদ সনৎকুমারের কাছে গিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি কোন কোন বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন? নারদ তাঁর অধীত বিদ্যার দীর্ঘ বর্ণনা শুনিয়েছিলেন। বর্ণনায় গণিত ও অঙ্কগণিতের বিষয়ও ছিল। এ থেকে

পরিষ্কার যে, গণিতের বিষয়ে জ্ঞান লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হোত। এই বর্ণনায় গণিতের গুরুত্ব স্বভাবতই স্পষ্ট।

বৈদিক গণিত অতি পুরনো জ্ঞানবিধি। ভারতীয়রা ঋষি ও মনীষীদের পক্ষ থেকে বিশ্বকে উপহারস্বরূপ এই জ্ঞান প্রদান করেছে। ১৯১১ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে জগদ্‌গুরু স্বামী ভারতীকৃষ্ণ তীর্থ মহারাজ বৈদিক গণিত আবার লোকসমক্ষে আনেন। তিনি ২১ বছর বয়সে সাতটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তিনি দর্শন ও সংস্কৃত বিষয়েও যথেষ্ট

স্বামী ভারতীকৃষ্ণ তীর্থ

কৃতবিদ্য ছিলেন। গণিতের সমস্ত শাখার ওপর ১৬ খণ্ডে বৈদিক গণিত সঙ্কলন করেন। দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থগুলি হারিয়ে যায়। শেষ বয়সে তাঁর শরীর ও চোখ খারাপ হয়ে যায়, তবু তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে ১৬ খণ্ডের সারাংশরূপে একটি পুস্তক সঙ্কলন করেন।

বৈদিক গণিত ১৬ সূত্রের ওপর আধারিত গণিত শাস্ত্রের এক বিধিনিয়ম। এই শাস্ত্র অনুশীলনের ফলে তর্ক, প্রতিভা এবং নবীন উৎসাহ বিকশিত হয়। সূত্র এক পংক্তির। সেজন্য একে জানতে, বুঝতে এবং এর ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নের সমাধান করতে সহজ হয় এবং জটিল সমস্যার সমাধানও করা যায়। বৈদিক গণিত অধ্যয়নের ফলে মনঃসংযোগ বৃদ্ধি হয় এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি রুচি নির্মাণ হয়। এতে মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ছাত্রছাত্রীরা প্রতিভাশালী, অধ্যাত্মমনস্ক এবং একাগ্রচিত্ত হয়ে সমস্ত কাজ সমর্পণভাবে করার উপযুক্ত হয়।

বৈদিক গণিত ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন নির্মাণ করতে সক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন Magic Mathamatics, Speedy Mathematics ইত্যাদি নামে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। ক্যালকুলেটরের একটা সীমা আছে, কিন্তু বৈদিক গণিত অসীম। স্বামী ভারতীকৃষ্ণ তীর্থের ভাষায়— "The Sutras apply to and cover each and every chapter of each

রামানুজন

and every branch of Mathematics : Arithmatics, Algebra, Geometry, Trigonometry, Astronomy, Calculas etc. The Sutras are easy to understand, easy to apply and easy to remind."

মার্কস বলেছেন, 'ভারতের কোনো ইতিহাস নেই। যদি কোনো ইতিহাস থাকে তা হলো বিদেশি আক্রমণকারীর সামনে নতজানু হওয়ার।' মেকলে ভারতবাসীকে গৌরবহীন নির্মাণ করে কালো ইংরেজ তৈরি করার ঘোষণা করেছিলেন। ম্যাক্সমূলার অর্থের লোভে বেদের বিকৃত অনুবাদ করে প্রতি পৃষ্ঠার জন্য পাঁচ পাউন্ড পেয়েছিলেন। এই তিন ম-কার আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ইতিহাস বিকৃত করেছে এবং আমাদের গৌরবগুলিকে বিদেশিদের নামে যুক্ত করে আমাদের স্বর্ণপৃষ্ঠাকে কালিমা লেপনের প্রয়াস করেছে। যেমন— পিথাগোরাসের ৪০০ বছর আগে বৌধায়ন উপপাদ্যের ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু তা পিথাগোরাসের নামেই প্রসিদ্ধ করা হয়।

জন ফ্লেচর (১৭৪৮—১৮১৯) একজন স্কটিশ গণিতজ্ঞ। তিনি ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লিখেছিলেন যে, খৃষ্টের জন্মের অনেক আগে ভারতীয়দের গ্রহ, নক্ষত্র বিষয়ে জ্ঞান ছিল। কিন্তু আজ পৃথিবীতে জন ফ্লেচরের নামেই তা প্রয়োগ করা হয়।

আর্যভট্ট পাই-এর মান ৩.১৪১৬ নির্ধারণকারী প্রথম গণিতজ্ঞ ছিলেন। তিনি জ্যা (Sines)-র মান নির্ধারণ করে গণিতের অনেক সমস্যার সমাধান করেন। আজ হিন্দু পঞ্চাঙ্গ আর্যভট্টকৃত গণনার ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে। নিউটনের ৫০০ বছর আগে দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন। সিদ্ধান্ত শিরোমণি, লীলাবতী, বীজগণিতম্ ইত্যাদি তাঁর বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিদ্যমান।

বরাহমিহির সম্রাট বিক্রমাদিত্যের রাজজ্যোতিষী এবং নবরত্নের একজন ছিলেন। তাঁর বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

প্রথম আর্যভট্ট ৫ম শতাব্দীর মহান গণিতজ্ঞ ও জ্যোতিষাচার্য ছিলেন। তাঁর আর্যভট্টীয়ম্ গ্রন্থ লোকপ্রসিদ্ধ। পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা করে— তিনিই বিশ্ববাসীকে সর্বপ্রথম জানান। জ্যোতিষ ও গণিতের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত'-এর রচয়িতা ব্রহ্মাগুপ্ত ছিলেন। সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থেরও রচয়িতা তিনি।

'শ্রীনিবাস রামানুজন—সংখ্যা সিদ্ধান্ত, ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি-সহ গণিতের সমস্ত শাখায় সাবলীল গণিতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর প্রতিভাকে সম্মান জানিয়ে রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেছিল।

সুতরাং গণিতশাস্ত্রে ভারতই পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী— একথা সকলকে স্বীকার করতেই হবে।

(লেখক শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাসের অখিল ভারতীয় অধ্যক্ষ)

পরম্পরা

সেবা কার্যের পরম্পরায় বিভিন্ন ভারতীয় সংগঠন

রবীন সেনগুপ্ত

সেবা কার্য হলো সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ। তবে এই সেবা কার্যেরও ভিন্নতা রয়েছে। সব সংগঠন সব ধরনের পরিষেবা প্রদান করে না। যেমন দেশপ্রেম শিক্ষা ও তার বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হলো বিশ্বের মধ্যে বৃহত্তম। কিন্তু হরিনাম সংকীর্তন, ভাগবত, গীতা প্রচার ও ভক্তিযোগ পরিষেবার ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম সংগঠনটির নাম হলো ইস্কন। আর এস এস গীতা ও ভাগবত যে চর্চা করে না তা নয়, তবে ইস্কনের মতো এই বিষয়ে তারা এতটা সময় দেয় না। আবার ইস্কন তো মূলত কৃষ্ণ সংক্রান্ত গ্রন্থই প্রচার করে। সমস্ত ধরনের হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রচার কিন্তু ইস্কন করে না। এই বিষয়ে গীতা প্রেস গোরক্ষপুর সবার চেয়ে এগিয়ে। গীতা প্রেসের প্রায় ১৮০০ রকমের গ্রন্থ আছে। তার মধ্যে বিভিন্ন আকৃতির গীতা গ্রন্থটিই রয়েছে ৯ প্রকারের। জয়দয়াল গোয়েন্দকা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই গীতা প্রেসের সূচনা করেছিলেন।

তীর্থযাত্রীদের সেবা অনেক সংস্থাই করে থাকে। কিন্তু এই ব্যাপারে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হলো সবার শ্রেষ্ঠ। আবার বেদান্ত প্রচারের ব্যাপারে রামকৃষ্ণ মিশনের তুল্য সংস্থা বড় একটা দেখা যায়। না। স্কুলের মোট সংখ্যার নিরিখে বিদ্যাভারতী হলো সকলের সেরা। তারা দেশে ২৩ হাজারেরও বেশি স্কুল চালাচ্ছে। তাতে ৩৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে। আর শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ অনেক দিন আগেই সিটু আর ইনটাককে অতিক্রম করে চলে গিয়েছে।

ধ্যান শিক্ষার ব্যবস্থা আর এস এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ইস্কন, ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন সবারই রয়েছে। কিন্তু এই ব্যাপারে সবাইকে অতিক্রম করে গেছে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। দাদা লেখরাজ প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার মূল কেন্দ্র মাউন্ট আবুতে। সারা বিশ্বের নানা দেশেই ব্রহ্মাকুমারী ছড়িয়ে পড়েছে।

বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে অধিক সম্প্রদায় আছে সনাতন হিন্দু ধর্মের মধ্যেই। এই বিপুল সংখ্যক সম্প্রদায়কে সুসংহত এবং ঐক্যবদ্ধ করার কাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থাটির নাম হলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।

প্রাণায়াম শিক্ষা ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ব্যবস্থা সারাদেশে অনেক সংস্থাই করে থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংস্থা হলো পতঞ্জলি যোগপীঠ। বাবা রামদেব পরিচালিত এই সংস্থাটিই যোগ পরিষেবার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ভারতীয় সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য শিক্ষার ব্যাপারে বিশ্বের বৃহত্তম সংগঠন হলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র বিষয়বস্তু নিয়ে লক্ষ লক্ষ পণ্ডিত বিশ্বজুড়ে গবেষণা করছেন। তাদের এই গবেষণার সামান্য একটা অংশ জনগণ পেয়ে থাকে গ্রন্থ, লাইব্রেরি ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে। কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় এমন অনেক জানার বিষয় নিয়ে গবেষণা হয় তা অনেকেই কাছেই পৌঁছয় না। এই অভাব পূর্ণ করার জন্য একটা বিশাল মাপের জ্ঞানযোগ পরিষেবা কেন্দ্র উদ্বোধনের প্রচেষ্টা করছিলেন অনেকেই। বিশেষ করে সনাতন হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয় অনেক গবেষণাই মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। সেই জন্য যথেষ্ট সংখ্যক মেমারি কার্ডের মধ্যে কোটি কোটি গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য বিষয়গুলি ধরে রেখে ছোট ছোট গবেষণা পত্রকের আকারে বিনামূল্যে তা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রতিবেদকের নেতৃত্বে ২০০০ খৃষ্টাব্দে তৈরি হয়েছে— 'রবীন সেনগুপ্ত তথ্য ও সংস্কৃতি পরিষেবা (ওয়ার্ল্ড রিসার্চ এন্ড ডাইরেকশান প্রজেক্ট)'। এই প্রজেক্ট স্বস্তিকায় গবেষণামূলক রচনাও প্রচার করে। পূর্বে উল্লেখিত সংস্থাগুলির মধ্যে এটিই নবীনতম সংস্থা এবং মাস এডুকেশনের ক্ষেত্রে এখন এই ভারতীয় সংস্থাটিকেই ওয়াকিবহাল মহল বৃহত্তম বলে গণ্য করে। ইন্টারনেটেও সংস্থাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই ভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ও ব্যক্তিগত সাধনার মাধ্যমে হিন্দু সংস্থাগুলি বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা লাভ করায় আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। ∎

গ্রামে স্বাস্থ্য-শিবির

কৌশিক গুহ

অমিতকাকুরা বলেছিল, ‘শহরের কাছাকাছি একটা গ্রামে যাচ্ছি রবিবার খুব সকালে। সারাদিন সেখানে থাকা। কাজকর্ম। বিকেলের পর ফেরা।’ কি জন্যে যাওয়া? বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ৭ এপ্রিল। গ্রামে স্বাস্থ্য শিবির করাই উদ্দেশ্য। সাতজন ডাক্তার যাচ্ছে। সঙ্গে থাকছে ওষুধপত্র। সকাল নটা থেকে শুরু হয়ে যাবে রোগী দেখা। তার আগে নাম লিখে নেবে গ্রামের কর্মীরা। তারাই উদ্যোগ নিয়েছে। তাপসের বিপুল উৎসাহ। সে গ্রামের চারপাশে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল। অশোক সামন্ত রিকশো ভ্যানে চড়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছে : ওইদিন আসুন স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে। কোনো পয়সা লাগবে না। সব শারীরিক অসুবিধার কথা জানালে ডাক্তারবাবুরা পরীক্ষা করে ওষুধপত্র দেবেন।’ শ্যামল সাউরা পোস্টার লাগাল। তিনদিন বিকেলে জোর প্রচার হলো। অমিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জোগাড় করতে লাগল। স্বাস্থ্য-শিবির আয়োজন করলে অনেকরকম দিক ভাবতে হয়। তাপসদের বাড়িতে ডাক্তারদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল আগে একবার। এবারও হলো।

সকাল থেকে নাম লেখানো শুরু হয়ে গেল। গ্রামের কয়েকজন খুব উৎসাহে কাজ করতে লাগল। ডাক্তারদল এসে পৌঁছোল সকাল আটটায়। আগে গ্রামে গাড়ি ঢুকত না। এখন ঢুকে যায়। ওদের পথ দেখিয়ে আনার লোকজন ছিল। মোটরবাইক নিয়ে তিনজন ছিল গ্রাম থেকে একটু দূরে। তারা সেলফোনে খবর দিল তাপসকে, ‘ডাক্তারবাবুরা এসে গেছেন। দুটো গাড়ি। গ্রামে নিয়ে যাচ্ছি।’ তাপস ব্যবস্থা রাখতে বলল নয়নচাঁদকে জলটল তুলে। বাড়িতে খাবার তৈরি হয়েছে। মুড়ি নারকেল নাড়ু। ছোলা সেদ্ধ। পাঁপড় ভাজা। নারকেল কোরা। তালগুড়। এরকমই কথা ছিল ডাক্তারদের সঙ্গে। অন্য খাবার পছন্দ নয় তাদের। গ্রামে এসে গ্রামীণ-ছোঁয়া লাগা খাবার খেতেই ভালোবাসে। ডাক্তার দলে সাতজন। চারজন পুরুষ ডাক্তার তিনজন মহিলা ডাক্তার। তাপস বলল, ‘ডাক্তার দাদাদিদিরা তোমরা তৈরি হয়ে ক্যাম্পে চলে এসো।’

কথা ছিল নটা থেকে দেখা শুরু হবে। একটুও দেরি হয়নি। দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিল সকলে। শৃঙ্খলা মেনে দ্রুততায় কাজ। গ্রামের বয়স্ক মানুষরা এলেন। তাঁদের দুটো উদ্দেশ্য, স্বাস্থ্য-শিবির কেমন হচ্ছে তা লক্ষ্য করা। আর সেই সঙ্গে নিজেদের শরীর দেখিয়ে নেওয়া। ছোটোদের আর মেয়েদের চিকিৎসাই বেশি গুরুত্ব পাবে— এমন কথা বলা হয়েছিল।

খুব ভালোভাবে সবকথা শুনে নেওয়ার পর পরীক্ষা ওষুধ দেওয়ার পালা। ডাক্তারদল অনেক ওষুধ এনেছিল বন্ধু-বান্ধবদের কাছে চেয়ে চিন্তে। সেইসঙ্গে আয়োজকরা কিছু ওষুধ কিনে রেখেছিল। দুপুর একটা পর্যন্ত রোগী দেখার কাজ চলল। রোগী দেখা নয়, স্বাস্থ্যপরীক্ষা। পরামর্শ দেওয়া চলতে থাকল। প্রথম কথা হলো, শরীর ঠিক রাখতে হবে। সেজন্যে শরীরচর্চা জরুরি। খেলাধুলো ব্যায়াম কেমন হবে সে কথা বলা হলো। সাধারণ খাবার খেয়ে শরীর যাতে রক্ষা করা যায় সেসব পরামর্শও মন দিয়ে শুনলেন সকলে। ডাক্তারদলের নেতা সুমন্ত মজুমদার বললেন, ‘অসুখের বিরুদ্ধে লড়ার কাজ চলে তিনভাবে— নিরাময়, নিবারণ, নিয়ন্ত্রণ। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে অনেক অসুখকে দূরে ঠেকিয়ে রাখা যাবে।’

পাপিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ‘আগে গ্রামে দূষিত জলের জন্যে অনেকরকম অসুখ হোত। খুব ভয়ঙ্কর চেহারা নিত। এখন নুন চিনির জলে খুব সহজে প্রাথমিক সমস্যার সমাধান করা যায়। দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক করা মানে ফাস্টফুড ইত্যাদি খাওয়া নয়। যা সত্যিই শরীরের পক্ষে উপকারী তা বুঝে খাওয়া। সাধারণ খাবার খেয়ে সাধারণ পরিবেশে যাতে শরীর সুস্থ রাখা যায়, সেকথাই আমরা বলবো বারবার। সকলকে ভালো থাকতে হবে সবসময়— এটাই আসল কথা।’

ডাক্তারদলে সুমন্ত পাপিয়া ছাড়া ছিলেন দময়ন্তী গুপ্ত, রাজর্ষি রায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্ব মুখোপাধ্যায় আর এষা ঘোষ। দুপুরে তাপসদের বাড়িতে খাওয়া। ভাত ডাল ভাজা সবজির সঙ্গে পুকুরের দুতিন রকম টাটকা মাছ। আমের চাটনি। ঘরে পাতা দই। ডাক্তাররা ছাড়া খেল আরও পঁচিশজন। খাওয়ার পর আবার শিবির চলল। সাড়ে চারটার সময় সব বন্ধ করে সুমন্তরা বেরিয়ে পড়ল। গ্রামের নানাবয়সী লোকজন বিদায় জানাল। কেউ কেউ বলল, ‘আবার এসো তোমরা।’ গ্রামের সকলেরই মনের কথাটা হয়তো তারা বলল।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বই কথা কই

শুধু পড়া আর পড়া

ওদের স্কুলের সিলেবাস খুব বেশি নয়। যাঁরা সিলেবাস তৈরি করেন তাঁদের ভাবনাচিন্তায় থেকেছে ছোটোদের উপর বেশি বোঝা নয়। আনন্দে শিখবে সহজভাবে। কিন্তু যাঁরা শেখাবার দায়িত্বে আছেন তাঁরা খুব চাপ দেন। আনতে হবে এতগুলো মোটা মোটা খাতা। এমনকী ডিকশনারি। রোজই ব্যাগটা বইতে গেলে কষ্ট হয় রিয়ার। বোঝা কমালে স্কুলে বকুনি খেতে হবে। তার কখনও কখনও মনে হয় রোজ এত বোঝা নিয়ে যাওয়ার কি দরকার! স্কুলে কি ডিকশনারিও নেই। শিক্ষিকা তো একটা বই আনতে পারেন ক্লাসে। তাতেই হয়ে যাবে। একদিনে তো অনেক শব্দ শেখা হচ্ছে না। শুধু কয়েকটা হচ্ছে। রিয়া তার সামান্য বুদ্ধিতে কিছুই বুঝতে পারে না। শিক্ষিকারা বড় কঠিন মুখ করে কথা বলেন। ছাত্রীদের তাঁরা শত্রু ভাবেন। দূরে দূরে রাখতে চান। কোনোদিন পাশে এসে পিঠে হাত রেখে বলেন না, 'কি হয়েছে রিয়া? তোমার পড়া বুঝতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে?' সে ভাবে যদি শিক্ষিকারা বন্ধুর মতো পাশে থাকেন তাহলে অনেক কাজ হয়ে যায়। দাদাই বলত, 'আসল শিক্ষক হবে ছেলেমেয়েদের আচার্য-বন্ধু- দিশারী।' রিয়া ওইরকম কাউকে পায়নি তার স্কুলে। মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। রাগী-রাগী মুখের শিক্ষিকারা যেন ভাবেন ছাত্রীরা বন্দীশালায় রয়েছে। তাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। যেমন বলা হবে তেমনি করবে। চাপের উপর চাপ। ছোট ছোট মেয়েরা ঠিকমতো শিখতে পারছে কিনা ভাবা হচ্ছে না। রোজ সকালে সাতটায় বাসে ওঠে। ছুটির পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল পাঁচটা। একটু বাদে অনিন্দিতা দিদি পড়াতে আসবে। তারপর পৌলমীদি। স্কুলের বাড়ির কাজ শেষ করতে করতে সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। সকালে ইচ্ছে করে একটু বেশি সময় শুয়ে থাকতে। পারে না। ঠিক সাতটায় বাস এসে যাবে। মা ডাকে, 'রিয়া উঠে পড়ো। তোমার দেরি হয়ে যাবে।' শনিবার রবিবার স্কুলে ছুটি। ওদিন একটু বেশি ঘুমোয়। কিন্তু মা মনে করিয়ে দেয়, 'স্কুলের হোমটাস্ক করতে হবে রিয়া।'

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১.বিশ্ব ক্যান্সার দিবস কবে?

২.ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন কি জন্যে গঠিত?

৩.বিক্রম সরাভাই স্পেস সেন্টার কোথায়? বিক্রম অম্বালাপ সরাভাই কে ছিলেন? তাঁকে বলা হয়?

৪.গত এক দশকে তামাকের জন্য ক্যান্সার অসুখে আক্রান্ত হয়ে কতজন মারা গেছে?

৫.'নাগিনী কন্যার কাহিনী' কে লিখেছেন?

উত্তর : ১. প্রতি বছর ৪ ফেব্রুয়ারি। ২. মহাকাশ গবেষণার জন্যে। ৩. তিরুবন্তপুরম। কেরল। ভারতের পদার্থবিদ। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার পথিকৃৎ। ৪. পাঁচ কোটি মানুষ। ৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফিরে পড়া

অনুভব

সুকান্ত ভট্টাচার্য

(১৯২৬-১৯৪৭)

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন,
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো—
দেখি এই দেশে অন্ন নেই কো কারো

অবাক পৃথিবী! অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার
হিসেবের খাতা যখনি নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত—'রক্ত খরচ' তাতে;
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম!

পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ করা নারী-স্বাধীনতা নয়

সুতপা বসাক ভড়

সম্প্রতি ফ্যাশন পত্রিকা ভোগ-এর বানানো দীপিকা পাড়ুকোন এবং আরও ৯৮ জন দ্বারা অভিনীত ভিডিও 'মাই চয়েস' নিয়ে খুব চর্চা চলছে। দু'মিনিটের এই ভিডিওটিতে বলা হয়েছে— আমি যেমন খুশি পোশাক পরি, যেখানে খুশি যাতায়াত করি, বিয়ের আগে এবং পরে যার সঙ্গে খুশি সম্পর্ক করি— এসব আমার মর্জি (মাই চয়েস)। দীপিকা পাড়ুকোনের এই হঠকারী মন্তব্যে নারীশক্তি জাগরণে অগ্রণী অনেক মহিলাই আহত হয়েছেন। এই ভিডিওটির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রখ্যাতা লেখিকা শোভা দে এবং অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিন্হা বলেছেন যে, 'নারীর কি শুধুমাত্র পুরুষসঙ্গী বদল করাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য? নারীর সত্যিকারের বিকাশের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রোজগার, বুদ্ধিমত্তা, চারিত্রিক দৃঢ়তা— এগুলি কি মূল্যহীন? তাই যদি হয়, তাহলে ডাক্তারদের মতে একাধিক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক মানে এড্স, সার্বাইকল ক্যান্সার ইত্যাদি অসুখকে ডেকে আনা। টিভির বেশিরভাগ চ্যানেল নিজেদের প্রচার এবং টি. আর. পি. বাড়াবার জন্য সস্তা চটকদার, মসলাদার বিষয়ের বিতর্ক সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে এর পেছনে ওই সংস্থা, চ্যানেল বা পত্রিকাটির প্রচার প্রসার এবং বিক্রি বাড়ানোই থাকে আসল উদ্দেশ্য।' বিতর্কিত এই ভিডিওটি কিশোরী, তরুণী, যুবতীদের মধ্যে ঔৎসুক্যর সৃষ্টি করেছে। তারা এই ভিডিওটি দেখার জন্য উদগ্রীব। শোভা দের মতে, 'মেয়েরা যেভাবে এটি দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, যদি এটা পুরুষদের কাজ হোত তাহলে জনসমক্ষে তাদের ধরে পেটানো হোত।' ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হচ্ছে না। বিবাহোত্তর সম্বন্ধের জন্য পুরুষদের আইন মেনে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। যদি কেউ ভিডিওটির দ্বারা প্রভাবিত হয় তাহলে তো নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একই দুষ্কর্মের জন্য একই শাস্তি হওয়া উচিত!

অঙ্গনা

আমরা অনেকেই প্রায়শ দেখি যে, অনেক পুরুষ তাদের স্বাধীনতার সুযোগ অন্যায়ভাবে নেয় আর মেয়েদের তা করতে দেয় না। তাহলে কি গুটিকতক মেয়ে স্বাধীনচেতা হয়ে ঠিক পুরুষের ওই কাজগুলিই করবে, যেগুলি নিন্দনীয়— পুরুষ এবং নারী দুজনের জন্যই। তাহলে ওইসব পথভ্রষ্ট পুরুষ এবং তথাকথিত আধুনিক নারীর মধ্যে পার্থক্য কী রইল? এর মধ্যে একজন মানুষ হিসাবে দীপিকা পাড়ুকোন কোন বিশেষ পথ দেখাতে চেয়েছেন যা মেয়েদের তথা সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য? শুধুমাত্র পুরুষজাতির অন্ধ অনুকরণ করেই নারীজাতির উন্নয়ন সম্ভব? শুধু এবং শুধুই অনুকরণ? মেয়েদের নিজস্ব কোনো যোগ্যতা, অস্তিত্ব, ব্যক্তিত্ব কিছুই নেই?

কোনো স্বাধীনতাই সম্পূর্ণ নয়। স্বাধীনতার সঙ্গে আসে কর্তব্য ও দায়িত্ব। এগুলি ছাড়া স্বাধীনতা অসম্পূর্ণ। নারীর প্রতিবাদ পুরুষদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত। পুরুষের করা অন্যায়গুলির পুনরাবৃত্তি যদি মহিলারা করতে শুরু করে, তাহলে কি এর মীমাংসা হবে? কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়, যে-কোনো বিচারধারা সর্বদা একরকম হতে হয়, নতুবা কালচক্রে তা শেষ হয়ে যায়। সেজন্য পুরুষের জন্য যেগুলি অন্যায়, সেগুলি মহিলাদের জন্যও অন্যায়। যদি শুধুমাত্র পুরুষবিরোধিতা করার জন্যই হয়ে থাকে তাহলে আমরা মেয়েরাও সেই বিরোধিতা থেকে বাঁচব না ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস সেই কথাই বলে।

দুর্ভাগ্যের কথা, এই যে নারীশক্তি জাগরণের নামে এই যে হইচই হচ্ছে, তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো নারীজাতিকে উপভোক্তা বানানো। বিভিন্ন কোম্পানি নিয়মিতভাবে কর্মরত মহিলাদের আয় এবং ক্রয়ক্ষমতার সমীক্ষা করে চলেছে। সেজন্য কোম্পানিগুলির বিজ্ঞাপনে আমরা কর্মরত ধনী মহিলাদের দেখি। দামী মোবাইল, ঘড়ি, গয়না, ফ্ল্যাট, পুরুষসঙ্গী এগুলিরই কার্যত মহিলাদের লক্ষ্য এবং তাদের নারীশক্তির প্রতীক হিসাবে বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়ে থাকে। মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য মানে একজন স্বাধীনচেতা গ্রাহক হিসাবে দেখানো। তাদের সত্যিকারের উন্নতি করার দিকে এইসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির কোনো ইচ্ছাই নেই।

পশ্চিমের থেকে আসা এই যে মহিলা স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করার প্রবণতাকে অনাবশ্যক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটা মহিলাদের এবং সমগ্র সমাজের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। যা ভাল তা আমরা অবশ্যই গ্রহণ করব। কিন্তু তাই বলে যা আমাদের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতিকারক, নিজের মর্জি (মাই চয়েস) বলে তাই করব, এটা কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। ■

অতিথি কলম

অস্পৃশ্যতা-মুক্ত সমাজ চাই

ডাঃ প্রবীণ তোগাড়িয়া

অস্পৃশ্যতা-মুক্ত সমাজ চাই— কথাটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে কি বেশ অসম্ভবই মনে হয়, তাই না? জাতিগত বৈষম্য বা জাতিভেদ প্রথা আজও সমাজের এত গভীরে প্রোথিত যে বিষয়টা অলীক স্বপ্ন বলেই অনেকের মনে হয়। জাতপাতের দীর্ঘ ও অন্ধকারময় ছায়া আমাদের সমগ্র সমাজের ওপরই ছেয়ে রয়েছে। বাস্তবে খাবার-দাবার থেকে জল, মন্দিরে প্রবেশাধিকার থেকে মৃত্যুর পরের ক্রিয়াকর্ম পর্যন্ত এই প্রথার দাপট। নজর খুললেই দেখা যাবে জাতিগত বৈষম্য যা আর এক অর্থে চরম অসাম্য তা আজ সর্বব্যাপী।

বহু শতাব্দীর এই মানসিক ও আর্থ-সামাজিক অবরুদ্ধ অবস্থা সত্ত্বেও আমরা আজও প্রত্যয়ী যে অস্পৃশ্যতাহীন সমাজ আমরা গড়তে পারব। এই বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের হিন্দু সমাজের সম্মিলিত প্রজ্ঞা ও প্রতিটি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যগুলিকে আত্মীকরণ করে নেওয়ার বিরল ক্ষমতা। আচ্ছা, আজ থেকে একশো বছর

> **‘হিন্দু মিত্র পরিবার’ একটি চমৎকার ভাবনা। প্রত্যেকটি হিন্দু পরিবার আর একটি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে। এই বন্ধুত্ব অবশ্যই একটি অন্য বর্ণের পরিবারের সঙ্গে হওয়া বাঞ্ছনীয়।**

আগে তো এটাই মানা হোত যে ‘মেয়েদের জন্য কোনো শিক্ষা নয়’। অথচ আজকের ভারতের মেয়েরাই বিশ্বের উচ্চ প্রযুক্তি থেকে মহাকাশ ভ্রমণ, রাজনীতি থেকে আইন বা শিল্প সর্বক্ষেত্রেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে।

আজকে এমন হাজারটা উদাহরণ দেওয়া যায় যা থেকে চমকপ্রদভাবে প্রমাণ হয়ে যাবে যে ভারত আজ পৃথিবীর বহু দেশের থেকে বহু ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে আছে। এই অগ্রণী ভারতেরই একটি পুরোধা সামাজিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস এস) যারা ভারতীয় সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে তার প্রভাব ও সদর্থক ছাপ রেখে চলেছে। তারা যদি অস্পৃশ্যতাহীন সমাজ গড়ায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তা হবে ভারতবাসীর কাছে বিরাট আশার কথা। তাই এই ভাবনা কোনো ফাঁপা বুলি নয়। আর এস এস-এর সংশ্লিষ্ট সমস্ত সংগঠনগুলি আজ সামাজিকভাবে সমন্বয়কারী একতার (Social Cohesive Unity) স্বপ্নকে সফল করতে দায়বদ্ধ।

এই প্রতিজ্ঞা থেকেই ভারতবাসীর কাছে ‘অস্পৃশ্যতাহীন সমাজ’ তৈরি আজ একটি বাস্তব ও আশু সফল হওয়ার প্রকল্প। সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী এও জানে যে এ কাজে সাফল্য আনার অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। সামাজিক রীতিনীতি, মানসিকতায় গেড়ে বসা শতাব্দী প্রাচীন অন্ধ বিশ্বাস ও নানান কুঅভ্যাস দূর করা বেশ শক্ত। পথ অবশ্যই বন্ধুর। কিন্তু ভারতের এ সবেরই মোকাবিলা করার জোর আছে।

জাতির প্রয়োজনে অতীতে বরাবরই হিন্দুরা একাত্ম হয়েছে। অনায়াসে জাতপাতের বেড়া ভাঙ্গা শুধু নয় ভাষা, প্রদেশ, আচার প্রভৃতি নানান বিভেদও অবলীলায় জয় করেছে। এর হাতে গরম প্রমাণ রয়েছে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্কালে, ১৯৬২ সালে চীনা আগ্রাসনের মোকাবিলায়, ১৯৬৫-এর পাকিস্তান যুদ্ধে, ১৯৭১ সালে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তাদের বাসভূমি থেকে বিতাড়নের সময়ও ভারত যেমন এককাট্টা হয়ে তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল তেমনই তারা লড়েছিল ১৯৭৫-৭৭ এর জরুরি অবস্থার অবসানের প্রতিজ্ঞায়। আর সর্বশেষ প্রমাণ ২০১৪-এর লোকসভা নির্বাচন যখন গরিষ্ঠাংশ হিন্দু কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মোদী সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সমাজের অন্তঃস্থলে ঢুকে যাওয়া জাতিগত বৈষম্য একটি সামাজিক অভিশাপ। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো ভূমিকা আছে। হ্যাঁ, এর জন্য প্রয়োজন ধৈর্যের। এটি হঠাৎ কোনো বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা বা ‘রোড শো’ করা নয়। এর জন্য দরকার ধাপে ধাপে কাজ এবং স্থির বিশ্বাস ও আন্তরিক মানবিক দৃষ্টি ও বক্তব্য নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছনো। এই কাজে তিনটি অতি সহজ পন্থা রয়েছে—

(১) যে গ্রামে পুকুর বা জলের উৎস তেমন ভালো নয়, সেখানে সকলের ব্যবহারের জন্য কূপ খনন যা দেবে জীবন অর্থে জল। (২) একটি মন্দির সেই অঞ্চলে নির্মাণ করা যা হিন্দুর বিশ্বাসের প্রতীক। (৩) একটি শ্মশান যেখানে সকল হিন্দুর অন্তিম পরিণতি। এই পথের অনুসরণই সমস্ত হিন্দুকে একই সূত্রে বাঁধবে।

কিন্তু শুনে যত সহজ আর অশ্রমসাধ্য বলে মনে হয় বাস্তবে তা নয়। এ কাজে হাত দিলে সহজেই দেখা দিতে পারে দীর্ঘদিনের পোষণ করা স্বাজাত্যবোধ, যা এক অর্থে মানসিক স্থবিরত্বেরই সামিল। বহু ক্ষেত্রে আবদ্ধ কারণে গ্রামীণ কুসংস্কার বিমুখ

বহুকালের জিইয়ে রাখা জাতিগত শত্রুতা। তবুও ভারতের মতো এক বিশাল সমাজে 'অভ্যন্তরীণ লড়াই'-কে সামলানোর মতো যে অস্ত্রও মজুত আছে তার নাম 'ভারতীয়তা'। দেশের সমস্ত হিন্দুরাই এক সুরে কলতান তোলেন যখন দেশের কোনো সঙ্কট দেখা দেয়-এর উদাহরণ আমরা আগে উল্লেখ করেছি। জাতিগত বৈষম্যে লালিত মানসিক স্তরকে বদল করে আত্মানুসন্ধানের যে পথে তাকে চালিত করতে হবে তার জন্য প্রয়োজন সচেতনতা অভিযান যার, মাধ্যমে দেশের অন্তর্নিহিত একতার প্রসঙ্গটি আপাত বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে। প্রায়শই সমাজের নানা জাতির লোককে নিয়ে একত্রে কোনো অনুষ্ঠান করতে হবে যাতে একাত্মবোধ জাগে। সম্পূর্ণ খোলা মনে পরস্পর অবিশ্বাসীদের মধ্যে সামাজিক আলাপ আলোচনা চালাতে হবে।

এই সূত্রেই 'হিন্দু মিত্র পরিবার' একটি চমৎকার ভাবনা। প্রত্যেকটি হিন্দু পরিবার আর একটি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবে। এই বন্ধুত্ব অবশ্যই একটি অন্য বর্ণের পরিবারের সঙ্গে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই দু'টি পরিবার তাদের উভয়ের নানান উৎসব— জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, বিবাহ, পুজো-আচ্চা বা অনুষ্ঠানে পরস্পর যোগ দেবে। অর্থাৎ একইসঙ্গে পালন করবে। তেমনই পারিবারিক অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, চুরি ডাকাতি বা মৃত্যুর মতো চরম মুহূর্তে তারা একে অপরের পাশে থাকবে।

এখানেই শেষ নয়। কমপক্ষে মাসে একবার করে একে অপরকে বাড়িতে ডেকে খাওয়া-দাওয়া করবে। অবশ্যই কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে নয়। একেবারে নিজের বাড়ির অভ্যন্তরে। মনে রাখতে হবে এক সঙ্গে বসে একই খাবার খাওয়ার মাধ্যমে এক অচ্ছেদ্য হৃদয়বন্ধন তৈরি হয়। ধীরে ধীরে জল, খাদ্য, মেলা মেশা না করার অদৃশ্য নিষেধগুলি অগোচরেই দুর্বল হয়ে যায়। এই দুই পরিবার বছরে একবার চড়ুইভাতি বা একসঙ্গে কোনো তীর্থস্থান বা আনন্দ ভ্রমণে অংশ নেবে। এইসবের জন্য ধনী হওয়ার প্রয়োজন নেই। উভয় পরিবারই এমনকী বাড়ি থেকে হালকা জলখাবার সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় বাগানে যেতে পারেন এবং পরস্পরে ভাগ করে তা নিতে পারেন। নিজেদের ছোটোদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ আনন্দে কাটাতে পারেন। মহিলারা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে পারেন। বিভিন্ন সামাজিক বিষয় নিয়ে পুরুষরা তাঁদের মতামত আদান-প্রদান করতে পারেন। এমনকী তাদের হোয়াট'স অ্যাপের ছবিও ! পরিবারে কলেজ-পড়ুয়ারা পরস্পরের ফেসবুক, হোয়াট'স অ্যাপ সদ্ব্যবহার করতে পারে। বনভোজন বা এমন কোনো অনুষ্ঠানে পুরো পরিবারের 'সেলফি' বা নিজস্বী তুলে রেখে দিতে পারে।

এটি শুধু একটা আনন্দের উত্তেজনা নয়। আমরা ইতিমধ্যেই একটি সমরসতা বিভাগ (cohesive unity) শুরু করেছি। এক হাজারেরও বেশি হিন্দু পরিবার মিত্র এতে যোগ দিয়ে সুখী হয়েছে। তারা এ বিষয়ে অন্যদেরও সচেতন করছে এবং আরও অনেক পরিবার 'এক জলাশয়, এক মন্দির ও এক শ্মশান' আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছেন। এই বিষয়ে গ্রাম্য-সমিতি এবং সাধুসন্তরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিহারে বেশিরভাগ জাতের নিজেদের জাতপাতের সমিতি আছে। তাঁদের নেতারা নিজেদের পুরানো ও অমূলক সংস্কারের কারণে শুরুতেই যে এসব মেনে নেবেন এমন নয়, কিন্তু অন্য জাতপাত সম্বন্ধে তাদের যে বিশ্বাস রয়েছে তা দূর করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাঁদের উদ্বেগের কথা আমাদের বুঝতে হবে এবং তাঁরা যেন তাদের মনের কথা প্রকাশের সুযোগ পান। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কোনো কোনো জাতির নেতাদের আবার নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ আছে। তাঁদের আশঙ্কা, এর ফলে তাঁদের নিজেদের ভোট ব্যাঙ্কে ফাটল ধরতে পারে। তারা কী মনে করবে এই ভেবে থেমে থাকা নয়। এই ধরনের ঘটনা ছোট গ্রাম বা শহরে ঘটতে পারে। তাই ধৈর্য ধরতে হবে ও খোলামনেই সব গ্রহণ করতে হবে। সমরসতা গোষ্ঠীর সদস্যরা সেইসব জাত-পাত থেকেই এসেছে যারা সকলের জন্যই কথা বলে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পঞ্চাশ বৎসর উপলক্ষে সারা ভারত জুড়ে যে সভা-সমাবেশ হচ্ছে, যেখানে আর এস এসের কার্যকর্তারা এবং আমাদের অনেকেই যাচ্ছেন এবং তা মহানগর, শহর, গ্রাম, উপজাতি অধ্যুষিত কিংবা প্রত্যন্ত অঞ্চল— যেখানেই হোক না কেন। এই রকম ৬০০ সভা-সমাবেশে আমরা লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়েছি এবং অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিয়ে বিভিন্ন জাতির সমিতি, স্থানীয় সমাজের বিদ্বজন, মহিলাদের গোষ্ঠী, বিভিন্ন পেশার মানুষজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। 'অস্পৃশ্যতা মুক্ত সমাজ' গঠনে সকলেই একমত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের কাছে কয়েকটা ঘটনার কথা জানিয়েছেন যে কিভাবে কিছু মানুষ তাঁদের জাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।

রাজ্য বা জেলা-ওয়াড়ি সফরে আমরা দেখেছি, তাদের এ বিষয়য়ে একটা ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকটা স্থানে সামাজিক রীতিনীতির কারণে তার প্রয়োগে ভিন্নতা রয়েছে। সভার মঞ্চ থেকে যখন জিজ্ঞাসা করি— আপনারা আপনাদের গ্রামে 'এক জলাশয়, এক মন্দির আর এক শ্মশান' চান কিনা, তখন বিশ-থেকে পঞ্চাশ হাজার জনতা গর্জে উঠে বলে— হ্যাঁ। আমাদের সবাইকেই তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে এবং এই কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। গত তিন মাসে সারা ভারতের সফরে অভিজ্ঞতা এই--- আকৃতি, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদে ভিন্নতা থাকলেও তাদের সকলের মধ্যে একটা সাধারণ আত্মা রয়েছে--- একটাই আত্মপরিচয় এবং তা হলো 'হিন্দু'। তাদের কাছে এটাই ভারতীয়ত্ব। এরকম গভীর ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও আলোচনার পর আমার স্থির বিশ্বাস— 'অস্পৃশ্যতামুক্ত সমাজ' ভারতে এক মহান সত্য। তবে কঠোর পরিশ্রম চাই। এক ভারত— এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সব পথগুলিই গৌরবের, কিন্তু কঠিন। সমাজ পরিবর্তন কোনো আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়, এটা হলো এক সুন্দর রূপান্তর (Metamorphosis)। একবার এই কাজ শুরু হলে এবং তা গতি লাভ করলে, আর ফিরে তাকানোর প্রয়োজন হবে না এবং এর পরিণতি মহান। ■

ড. আম্বেদকর ও সামাজিক ন্যায়বিচার

অধ্যাপক আশিস রায়

ভারতের ইতিহাসে অনগ্রসর ও অবহেলিত জনগণের মধ্যে আম্বেদকর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। পাণ্ডিত্যে ও বৌদ্ধিক বিচক্ষণতায় আম্বেদকর বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। দীর্ঘকাল ধরে উপেক্ষিত ভারতীয় জনগণের বিশেষত অবহেলিত মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য তিনি বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করেছেন। পিছিয়ে পড়া মানুষের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। অনগ্রসর শ্রেণীগুলির জন্য তিনি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ও আসন সংরক্ষণের দাবি জানিয়েছেন। আম্বেদকর ছিলেন ভারতের অবহেলিত শ্রেণীর প্রতিনিধি। পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতা বিরোধ ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। Dr. Verma-র মতে "Ambedkar was a Social Prophet of the untouchables." অর্থাৎ ড. আম্বেদকর ছিলেন অস্পৃশ্যদের সামাজিক ভবিষ্যৎবক্তা।

আম্বেদকরের মতে ভারতীয় জনগণের মধ্যে জাতিগত স্তরবিন্যাস সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচার বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত, জাতিভেদ প্রথাকে ধর্মীয় বিচার বিবেচনার সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়। জাতিভেদ প্রথা ও অস্পৃশ্যতামূলক আচরণ ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তাঁর মতে ভারতে জাতিভেদ প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে পেশাগত সামাজিক স্তরবিন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। এই স্তরবিন্যাস সমাজ জীবনের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর; অস্পৃশ্যতার ছাপ লাগিয়ে একশ্রেণীর মানুষকে যাবতীয় মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অস্পৃশ্য বলে সমাজে একটি শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মানুষ হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ছুৎ ও অচ্ছুৎ বিভাজন খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আম্বেদকরের মতে উচ্চবর্ণের ডাক্তার অস্পৃশ্যতার অভিযোগে রোগীর চিকিৎসা করেননি। অস্পৃশ্যতার কারণে বালককে ধর্মশালায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। অস্পৃশ্যতার কারণে দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাকে সাহায্য করা হয়নি। অস্পৃশ্য মানুষের খাবারের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করা হোত। এমনকী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোশাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাঁর মতে জাতিভেদ প্রথার অবসান ছাড়া অস্পৃশ্যতার অভিশাপের অবসান সম্ভব নয়। আম্বেদকর সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং অবহেলিত মানুষদের অধিকার আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মানব অধিকারের জন্য আন্দোলন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করে।

আম্বেদকরের মতে, হিন্দু ধর্ম ও সমাজব্যবস্থার মধ্যে অসাম্য ও বৈষম্য আছে। দলিত বা অনগ্রসর শ্রেণীগুলি আবার সমগোত্রীয় নয়। তাদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি নেই। আদর্শ সংগঠনের স্বার্থে আম্বেদকর সাম্য, স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও সৌভ্রাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর আদর্শ অনুসারে বর্তমানে ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। চতুর্বর্ণ সমাজব্যবস্থাকে দুর্বল ও পঙ্গু করে দেয়। তবে এ বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আম্বেদকরের মতপার্থক্য ছিল। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেননি। সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যবস্থা হিসাবে গান্ধীজী চতুর্বর্ণকে সমর্থন করেছেন।

জাতপাত ব্যবস্থার তীব্র সমালোচক আম্বেদকর ১৯২০ সালে নিম্নবর্ণের মানুষদের নিয়ে 'Independent Labour Party' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দলের বেশিরভাগ সদস্য ছিল অস্পৃশ্য। তিনি অস্পৃশ্য শ্রেণীকে হিন্দু সমাজ থেকে পৃথক করতে চেয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। আম্বেদকর গোষ্ঠীর পরিবর্তে ব্যক্তিকে অধিক গুরুত্ব দেন। তিনি ব্যক্তিকে সমাজের একক কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করেন। ভারতের সংবিধান সভার খসড়া কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তিনি মনে করেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপায়ণ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। নৈতিক দৃঢ়তা একটি জাতির গুরুত্বপূর্ণ গুণ, তারপরে বাক্‌স্বাধীনতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা। সুতরাং সামাজিক প্রগতিকে ব্যাহত করে এমন সব সামাজিক প্রথার

পরিবর্তন করার ইচ্ছা যাদের নেই, তাদের দ্বারা সামাজিক সাম্যের আদর্শ ও জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। গণতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো ছাড়া গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ঐক্য, সাম্য, জনস্বার্থের প্রতি আনুগত্য, জাগরণের পারস্পরিক সহানুভূতি না থাকলে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

মূল্যায়ন : আম্বেদকর গণতান্ত্রিক সমাজ ও সরকারের মধ্যে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন তা রাজনৈতিক মতাদর্শের জগতে নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কিন্তু আম্বেদকরের অন্যতম ত্রুটি হলো তিনি সমাজ সংস্কারকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অগ্রবর্তী হিসাবে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর চিন্তার আর একটি সীমাবদ্ধতা হলো যে, স্বাধীন দেশে নিপীড়িত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থে আন্দোলন ও আইন তৈরি করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যে সম্ভব, সেই আত্মবিশ্বাস তাঁর ছিল না। তিনি শুধুমাত্র আইন রচনার মাধ্যমে অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সাম্য চেয়েছেন। কিন্তু সহস্র বছরের পুরাতন সামাজিক কুপ্রথা যে শুধুমাত্র আইন করে দূর করা যায় না, কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন প্রয়োজন এবং জনমানসের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার, সেই সত্য আম্বেদকর উপলব্ধি করতে পারেননি। সেই কারণে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিজ শ্রেণীর জাগরণে নেতৃত্ব না দিয়ে পলায়ন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে আম্বেদকরের লড়াই ছিল একক। পশ্চিমি উদারনৈতিক শিক্ষা তাঁর গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গিকে সজীব রাখতে দেয়নি। তা সত্ত্বেও আম্বেদকর স্বাধীন ভারতের নিপীড়িত নির্যাতিত বঞ্চিত মানুষের সহস্র বছরের মর্মবেদনাকে তত্ত্বের আকারে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন এবং ভারতের সংবিধানে এই দাবির প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছেন— এটাই তাঁর সার্থকতা। ভারতের সংবিধানের রূপকার হিসাবে এবং সমাজে সমান অধিকার ও ন্যায়বিচারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে আম্বেদকরের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র :
(১) Dr. Verma–Modern Indian Political Thought.
(২) সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা ও জাতীয় আন্দোলন।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক)

দেশের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন ড. আম্বেদকর

প্রশান্ত বাজপেয়ী

যখন ড. আম্বেদকর সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য কোনো মত-পথে যাওয়ার ঘোষণা করেন— প্রচলিত শব্দে যাকে ধর্মান্তরকরণ বলা হয়, তখন খৃষ্টান মিশনারি ও মুসলমান মোল্লা-মৌলবিরা তাঁকে দলে টানার জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে। খৃষ্টান মিশনারিদের মনে হয়েছিল ভারতে শত শত বছর মাথা ঠুকে যে কাজ তারা করতে পারেনি, আম্বেদকরকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে পারলে তাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে। মোল্লা-মৌলবিদের মনে হয়েছিল, তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করার এটা একটা ভালো সুযোগ। আগা খাঁ, হায়দরাবাদের নিজাম এবং খৃষ্টান মিশনারিরা পর্যন্ত খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আম্বেদকর খুব সজাগ ছিলেন। সন্ত শ্রীগাড়গে মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন, অন্য ধর্মে যেতে পার, কিন্তু মুসলমান বা খৃষ্টধর্মে যেও না। বাবাসাহেব কথা দিয়েছিলেন তিনি ইসলাম স্বীকার করবেন না। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন, ‘‘অস্পৃশ্যদের ধর্মান্তরণের ফলে দেশের কী ভয়ঙ্কর পরিণাম হবে তা মনে রাখা প্রয়োজন। অস্পৃশ্যরা মুসলমান বা খৃষ্টান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরাষ্ট্রীয় হয়ে যাবে। তারা মুসলমান হয়ে গেলে মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে আর মুসলমানদের অহঙ্কার বেড়ে যাবে। তারা যদি খৃষ্টান হয়ে যায় তাহলে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৫/৬ কোটি বেড়ে যাবে, তার ফলে এদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব আরো মজবুত হয়ে যাবে।’’

ড. আম্বেদকরের জীবনী লেখক ধনঞ্জয় কীর লিখেছেন— ‘‘তাঁর মনে যদি রাগ বা বদলা নেওয়ার ভাবনা থাকতো, তাহলে পাঁচ বছরেই দেশের সর্বনাশ করে দিতে পারতেন। হিন্দুসংস্কৃতি ত্যাগ না করার মনোভাব তাঁর বরাবরই ছিল, তাই যে ধর্ম দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে বা অস্পৃশ্যদের অরাষ্ট্রীয় করে দেবে এরকম ধর্মকে তিনি স্বীকার করেননি।’’ তাঁর নিজের কথায়— ‘‘এ দেশের ইতিহাসে আমি ধ্বংসকারীরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকতে ইচ্ছুক নই।’’

বৌদ্ধধর্ম স্বীকার করার পক্ষে তাঁর যুক্তি ছিল, বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গ। তিনি নিজেই বলেছেন, আমি খুব সজাগ ছিলাম যে, আমার দ্বারা যেন এই দেশের সংস্কৃতি ও পরম্পরায় ধাক্কা না লাগে।

(সৌজনে : হিন্দী বিবেক)

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক
স্বস্তিকা
পড়ুন ও পড়ান

সন্ত্রাসবাদের আমরা-ওরা

শবরী ঘোষ

গৈরিক সন্ত্রাসবাদ শীর্ষক একটি তত্ত্ব কয়েকটি বহুল প্রচারিত পত্রিকার বিভিন্ন কলমে আলোচিত হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদ শব্দের পূর্বে 'গৈরিক' বিশেষণটি যুক্ত করে লেখকরা একটি রাজনৈতিক দল, কয়েকটি সংগঠন ও তাদের অনুগামী মানুষের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে যে সম্ভাব্য হিন্দু সন্ত্রাসের অশনি সঙ্কেত দেখা দিচ্ছে তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। হিন্দু সন্ত্রাসবাদের প্রকৃতি ও ফলাফল সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার পূর্বে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

ছদ্মধর্মনিরপেক্ষীরা গৈরিক সন্ত্রাসবাদ শব্দটির আমদানি করেছে। হিন্দু ও গৈরিক শব্দ দুটি নিশ্চয়ই সমার্থক নয়। ভারতের জাতীয় পতাকাতেও গৈরিক বর্ণ দেখতে পাওয়া যায়। গৈরিক বর্ণ হলো ত্যাগ এবং বৈরাগ্যের প্রতীক। অতএব গৈরিক বর্ণের অপমান পক্ষান্তরে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় ঐতিহ্যের অবমাননা। তাছাড়া তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দুই দল কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস তাদের পতাকায় ওই রংটি ব্যবহার করে। সে ক্ষেত্রে কিন্তু কারো কোনো আপত্তি দেখা যায় না। আবার, সাংসারিক আসক্তি থেকে মুক্তিকামী ভারতের সাধক- সাধিকারা ওই বর্ণের বস্ত্র পরিধান করেন। সুধী পাঠকমাত্রই জানেন যে, ওইসব সন্ন্যাসী সামাজিক ভেদাভেদকে প্রশ্রয় তো দেনই না, উপরন্তু তাঁরা সম্প্রদায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আর্ত মানুষের সেবায় নিয়োজিত আছেন। এর পরেও গৈরিক শব্দটির অপপ্রয়োগ কি অধ্যাত্মপিপাসু, সর্বত্যাগী, পরার্থে নিবেদিতপ্রাণ, বিশ্বমানবতার পূজারি ওই মানুষগুলির অপমান নয়? পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলি যখন ভারতের বিভিন্ন অংশে সন্ত্রাস চালিয়ে নিরীহ মানুষের প্রাণ নেয় তার জন্য যেমন কেউ 'চাঁদ তারা সন্ত্রাস' শব্দ প্রয়োগ করে না এবং যুক্তিসহ বোঝার চেষ্টা করে যে মুসলমান মাত্রই সন্ত্রাসবাদী নয়, তাহলে হিন্দুদের ক্ষেত্রে এই অদ্ভুত বৈপরীত্য কেন?

মুসলমান দুষ্কৃতিদের আক্রমণে নলিয়াখালিতে সর্বস্বান্ত হিন্দু পরিবার। (ফাইল চিত্র)

তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সম্পর্কে একটা নাক সিঁটকানোর ভাব আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি। বাবরি ধাঁচা ভাঙা নিয়ে এখনো এঁরা সোচ্চার। কিন্তু মুসলমানদের মন্দির ভাঙা নিয়ে এঁরা নীরব থাকেন কেন? U.T. Thakkur তাঁর 'Sindhi Culture' রচনায় দেখিয়েছেন, সেই ৭১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বিন কাশিমের সময় দেবল, নাইরুন এবং আরোর অঞ্চলের মন্দির ভেঙে সেখানে মসজিদ স্থাপন করা হয়েছিল। সেই শুরু। এর পরে গজনীর মামুদ ভারত আক্রমণকালে সোমনাথ ও মথুরাসহ বহু মন্দির ধ্বংস করে। S.A.A. Rizvi রচিত 'The Wonder That Was India' (Part II) গ্রন্থে রয়েছে, "Mohmud had assumed the role of defender of Sunni orthodoxy; he boasted of annihilating the Ismaili sect and ruthlessly plundered Hindu temples." সুলতান ইলতুৎমিস উজ্জয়িনী আক্রমণকালে প্রাচীন মহাকাল মন্দির ধ্বংস করেছিল। পারস্যের ঐতিহাসিকদের রচনায় সিকন্দর লোদীর হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা স্পৃহার কথা জানা যায়। ঐতিহাসিক Cunningham তাঁর 'Lucknow Gazette'-এ লিখেছেন যে, বাবরের আদেশে শ্রীরাম জন্মভূমিতে রামচন্দ্রের মন্দির ভেঙে হাজার হাজার হিন্দুকে হত্যা করে মীরবাকি খাঁ ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেছিল। A.L. Srivastava রচিত গ্রন্থ 'Medieval History of India'-তে আওরঙ্গজেবের আমলে এক হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংসের কথা লেখা রয়েছে। মধ্যযুগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমান শাসকরাও বহু মন্দির ধ্বংস করেছে। তালিবানদের হাতে বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের কথা আমরা এখনো ভুলিনি। ২০১৩ সালের ১৯ মে হুগলী জেলার বলাগড়ে মুসলমানরা কবরস্থান ঘিরে পাঁচিল তুলতে গিয়ে হিন্দুদের দেবোত্তর জমি গ্রাস করেছিল। এই নিয়ে সংঘাতে হিন্দুরা আক্রান্ত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তিও ভেঙে দেওয়া হয়। ইদানীং হিন্দু মন্দিরের সামনে গো-হত্যা করতেও একদল দ্বিধাবোধ করছে না। কারণ, তারা ভাল করেই জানে যে, কেউ এর প্রতিবাদ করলেই তাকে 'গৈরিক সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দেওয়া হবে।

'প্রত্যেক হিন্দু মায়ের চারটি সন্তান জন্ম দেওয়া উচিত' মন্তব্য করে সম্প্রতি একজন সমালোচিত হয়েছেন। কোনো কোনো

নারীবাদী বলেছেন যে, নারীকে কি এই একবিংশ শতকেও কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে দেখা হবে? হক কথা। কোরানে ২.২২৩ সুরায় লেখা হয়েছে, ''তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর।...'' বুদ্ধিজীবীরা কি দয়া করে বুঝিয়ে দেবেন 'শস্য ক্ষেত্র' শব্দের অর্থ কী? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৪৭ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ভারতে মুসলমান জনসংখ্যা ৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। কোটির হিসাবে সংখ্যাটা কত তা নিশ্চয়ই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। অধিকাংশ মুসলমান পরিবারেই, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা অনেক। অধিক সন্তানের 'বিপদ' সম্পর্কে তাদেরও সাবধান করা হচ্ছে কী?

মুসলমান জনসংখ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিষয় মনে পড়ল। গত ২২ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকার ইন্দৌর সংস্করণে প্রকাশিত খবর— নন্দকুমার সিংহ চৌহান জানিয়েছেন যে, জনসংখ্যার সার্বিক বৃদ্ধি গত দশ বছরে যেখানে ১৩.৪ থেকে ১৪.২ শতাংশ সেখানে শুধু মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২৪ শতাংশ। এর অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি বাংলাদেশি মুসলমানদের কথা উল্লেখ করেছেন। ২০০১ সালের তুলনায় ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের প্রায় সব জেলায় ৫ থেকে ৭ শতাংশ মুসলমান বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকা ও ওয়েবসাইট থেকে জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানের যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা কিন্তু গুরুতর। দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও মালদা জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। শতাংশের বিচারে যথাক্রমে ৬৩.৬৭ এবং ৫২.০৫। সম্ভবত আগামী দশকে উত্তর দিনাজপুরও একটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ (বর্তমানে ৪৭.৩৬ শতাংশ) জেলা হতে চলেছে।

এরপর ১৯৪৭ সালের মতো এরা যে আরো একবার ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের দাবি তুলবে না, সেকথা কে বলবে?

ভারতে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে যারা ধরা পড়েছে তাদের প্রায় ৯০ শতাংশই মুসলমান। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন বর্ধমান জেলার খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ড। ২ অক্টোবর '১৪ তারিখের এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মাত্র ২ জনের। কিন্তু বিস্ময় জাগিয়েছে নিহত জঙ্গির সদ্যবিধবা স্ত্রীর অবিচলিত চিত্তে সব কিছু সামলানো ও প্রমাণ লোপাটের কীভাবে অতটা নির্লিপ্ত হতে পারে? আসলে যে মাদ্রাসায় সে লেখাপড়া শিখেছে সেখানকার কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় প্রথম থেকেই ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে, কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালাতে গিয়ে মৃত্যু হলে তারা স্বর্গ লাভ করবে। এরকম মাদ্রাসা পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য। গত কয়েক বছরে উত্তর ২৪ পরগনা ও নদীয়ায় ৩৭টি খারিজি মাদ্রাসা তৈরি হয়েছিল যেখানে তালিম নেওয়া ২৭ জন মহিলা আপাতত নিরুদ্দেশ। বাংলাদেশের মৌলবাদী সংগঠন জামাত-উল-মুজাহিদিনের সঙ্গেও এদের যোগাযোগ প্রমাণিত। ভারতে বাস করে ভারতবিরোধী এই কার্যকলাপ কি ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে আমাদের বরদাস্ত করতে হবে?

গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে বিগত বছরগুলিতে কম মিছিল বা লেখালেখি হয়নি। কিন্তু সবরমতী এক্সপ্রেসের কামরায় আগুন দিয়ে গোধরা স্টেশনে যখন ৫৮ জন করসেবককে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তখন গর্জে উঠেছিলেন ক'জন? আবার গুজরাটে শুধু তো মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষই মারা যায়নি। সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইটগুলি জানাচ্ছে যে, নিহতদের মধ্যে ২৫৪ জন হিন্দুও ছিল। ১৯০৬, ১৯৪৬ বা ১৯৯২ এর দাঙ্গার কথা বাদ দিলেও ধর্মোন্মাদ মুসলমানদের হাতে কম হিন্দু প্রাণ হারায়নি। ১৯৯৮ সালে সেনার ছদ্মবেশে বন্ধনামায় যখন ২৪ জন নিরীহ কাশ্মীরিকে হত্যা করা হয় বা ২০০০ সালে যখন হামলা চালিয়ে অমরনাথের পথে ৩০ জন তীর্থযাত্রীকে হত্যা করা হয় তখন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষরা কী করছিলেন! ২০ ফেব্রুয়ারি '১৩ তারিখে ক্যানিং-এর নলিয়াখালিতে ৩০০ হিন্দু বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাটের সঙ্গে জড়িত ছিল তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ইমরানের নেতৃত্বে বহিরাগত মুসলমানরা। ক'জন প্রতিবাদ করেছিলেন? গুজরাট দাঙ্গার সময় মহিলাদের উপর যে অত্যাচার হয়েছিল তা নিয়ে এক সংখ্যালঘু অধ্যাপিকা আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছেন। সেই ৭১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে মুসলমানরা হিন্দু মহিলাদের ওপর যে চরম নির্যাতন করেছে তা নিয়ে বই লিখতে বসলে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের ৩২ খণ্ডের মহাভারতকেও অতিক্রম করে যাবে। বানতলা, কাটোয়া, সন্দেশখালি, হোসেনাবাদের ঘটনাগুলি নিয়ে কিন্তু কোনো 'গর্ভঘাতী পশ্চিমবঙ্গ' লেখা হয়নি।

উত্তর প্রদেশে যেসব মুসলমান স্বেচ্ছায় 'ঘর বাপসি' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিন্দুত্বে প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন। তারা যদি স্বেচ্ছায় ফিরে আসতে চায় তাহলে গৈরিক সন্ত্রাসবাদের ধুয়ো তোলা হবে কেন? ধর্মান্তরকরণ এবং স্বেচ্ছায় নিজধর্মে ফিরে আসার পার্থক্য কি তথাকথিত সুশীল সমাজের মাথায় ঢোকে না?

শিক্ষকতা জীবনের শুরুতে উত্তর ২৪ পরগনার একটি বিদ্যালয়ে আমার এক মুসলমান ছাত্রী অভিযোগ জানায়, 'হিন্দু মেয়েরা আমাদের সঙ্গে খেলতে চায় না।' কেন এমন করছে— এই প্রশ্নের উত্তরে একটি হিন্দু মেয়ে ফুঁসে উঠে বলল, 'কেন খেলব? জানেন, ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচ হলে ওরা পাকিস্তানকে সমর্থন করে। কারণ পাকিস্তানিরা মুসলমান।' আমি বললাম— 'দেখো, ক্লাসের সব মুসলমান মেয়ে তো পাকিস্তানের সমর্থক নয়। কেউ যদি সেরকম থাকে তাহলে তাকে বোঝাও যে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আমরা সবাই ভারতীয়। ভারতের মূল আদর্শ হলো সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণু হতে শেখো।' মেয়েটি বলল, 'ওরা শুনবে না। কারণ— ওরা তো এই দেশটাকে নিজের বলে ভাবতেই পারে না। আকবরের চেয়ে আওরঙ্গজেব, আবিদ হাসানের চেয়ে আজমল কাসভ, ওমর খৈয়ামের চেয়ে ওসামা বিন লাদেন-ই ওদের বেশি প্রিয়। 'ম্যাডাম বলুন তো, হিন্দুদেরই কেন সবসময় সহিষ্ণুতা দেখাতে হবে? হিন্দু হওয়া কি অপরাধ?' উত্তর দিতে পারিনি।

কেরলে সাংস্কৃতিক আন্দোলন—'বালগোকুলম্'

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক জীবনে কেরলের সামাজিক অবস্থা লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'কেরল একটা পাগলা গারদ'। সে সময় কেরল রাজ্য জাত-পাত, ছুঁয়া-ছুঁতে দীর্ণ ছিল। মানুষ মানুষের ছায়া স্পর্শ করলেও স্নান করতো। এখন সেই কেরলই শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে দেবত্ব লুকিয়ে আছে, সেই দেবত্বকে জাগ্রত করার কাজ করতে হবে। কেরলের বালগোকুলম্ স্বামীজীর সেই ভাবকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি, পরম্পরা ইত্যাদি জাগ্রত করার কাজ করে চলেছে। বালগোকুলমের কার্যপদ্ধতি খুবই সুন্দর। এখানে শিক্ষকরা 'রক্ষাধিকারী' নামে পরিচিত। তাঁরা বালগোকুলমের সদস্যদের একপ্রকার অভিভাবক। বালগোকুলমে বিদ্যার্থীদের সপ্তাহে একদিন বিশেষ কার্যক্রম হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা সময়ে শিশুরা নানাপ্রকার গান ও ভজন শেখে, গীতা মুখস্থ করে। তাদের ভাল গল্প বলা শেখানো হয় এবং নানান খেলাধুলা করানো হয়। সংস্কৃত ও মালায়ালাম ভাষায় এগুলি করানো হয়। এতে ধীরে ধীরে শিশুদের ওপর সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক প্রভাব নির্মাণ হয়। শিশুরা একসঙ্গে থাকার ফলে কোনো বিষয়ে কিছু বলার সাহস তৈরি হয়, সঙ্কোচ কেটে যায়। তাদের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব নির্মাণ হয়।

সাপ্তাহিক একত্রীকরণ ছাড়া মাঝে মধ্যে বিশেষ করে উৎসবের দিনে বিশাল সম্মেলন করা হয়। বিভিন্ন শাখা তাতে যোগ দেয়। শিশুদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও বেশি সংখ্যায় থাকেন। অভিভাবকরা সেদিন তাঁদের শিশুদের দ্বারা বিভিন্ন রকমের অভিনয় দেখেন। অনুষ্ঠানের আকর্ষণীয় দৃশ্য হলো, শোভাযাত্রায় হাজার হাজার শিশুর বালগোপাল সেজে অংশ নেওয়া। বালগোকুলমের সদস্য শিশু ও তাদের অভিভাবকরা ভারতীয় সংস্কৃতির সেই আপ্তবাক্য 'মাতৃ দেবো ভব', 'পিতৃ দেবো ভব', 'অতিথি দেবো ভব'-কে জীবনের অঙ্গ করে নিয়েছে। বালগোকুলমের আদর্শ হলো শ্রীকৃষ্ণ। প্রেম, বিশ্বাস, সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং সমাজে দুষ্টশক্তির বিনাশ করার জন্য প্রেরণাপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেদিন পূজা করা হয়। বালগোকুলম্ আন্দোলনের প্রেরণা কোনো ব্যক্তি নয়, কেরলের জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'কেশরী'। গত ৫০-এর দশকে কেশরী পত্রিকায় শিশুদের বিভাগে 'সংস্কার কথা' নিয়মিত প্রকাশিত হোত। তা জনমানসে খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলস্বরূপ ১৯৭০ সালে 'বালগোকুলম্' শুরু হয়। কেশরীর তৎকালীন প্রধান সম্পাদক এমএ কৃষ্ণান এই কাজে পূর্ণ সহযোগিতা করেছিলেন। প্রথম বছরেই রাজ্যের একাধিক স্থানে এর শাখা স্থাপিত হয়। ১৯৭৭ সালে জান্মাষ্টমীর দিন প্রথম সম্মেলনে হাজার হাজার শিশুর কৃষ্ণসাজে শোভাযাত্রা কেরলের মানুষের মন জয় করেছিল। ১৯৮০ সালে কেরলের সমস্ত জেলা, মহকুমায় এর শাখা শুরু হয়ে যায়। রাজ্যের প্রথম অধিবেশন হয় গুরুভায়ুর মন্দিরে। ১৯৮১-তে 'চিলড্রেনস্ কালচারাল মুভমেন্ট' নামে এর পঞ্জীকরণ করা হয়।

কেরলরাজ্যে বালগোকুলম্ আন্দোলন এত প্রভাব বিস্তার করে যে আজ কেরলবাসীর ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণের ছবি রাখার প্রচলন হয়ে গেছে। এমনকী বাড়ি ও দোকানের নামও শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামে রাখা শুরু হয়েছে। কেরল রাজ্য সরকার আন্দোলনের ব্যাপকতা আন্দাজ করে জন্মাষ্টমীর দিন ছুটি ঘোষণা করেছে। কেরলের প্রসিদ্ধ কবি কুঞ্জুনী মাস্টার, মালী, এন এন কক্কড় প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তি বালগোকুলমের উপদেষ্টা রূপে কাজ করছেন। কোজিকোড়ের অনুরাধা ভাল্লার কথায়— "বালগোকুলমের কেন্দ্রে শিশুকে একেবারে মায়ের স্নেহেই শিক্ষা দেওয়া হয়। আমার সৌভাগ্য যে, আমিও বালগোকুলম্ থেকেই জীবন গঠনের শিক্ষা পেয়েছি।"

একটি ইতিবাচক ভাবনা কীভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংঘটিত করতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ কেরলের বালগোকুলম্। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

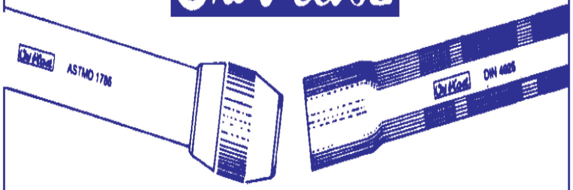

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

" অপর সকল দেশ অপেক্ষা ভারতই বিশেষভাবে মহীয়সী নারীগণের জন্মদাত্রী। ইতিহাস, সাহিত্য— যে দিকেই আমরা দৃষ্টিপাত করি না কেন, সর্বত্র তাঁদের মহিমময় রূপটি উদ্ভাসিত। ভারত তাঁদের মাতৃস্নেহে পুষ্ট করেছে, মর্যাদা দান করেছে, অনন্তকাল ধরে তাঁদের স্মৃতি পবিত্র করে রেখেছে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

পুস্তক প্রসঙ্গ

বাঁকুড়ার ভূগোল-ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ

সুকেশ মণ্ডল

ইতিহাস কথা বলে। ভালবেসে সেই কথা শুনতে হয়, পড়তে হয় ও জানতে হয়। ভাবী প্রজন্মকে সেই কথা শুনাতে হয়, তাতে দেশ ও জাতির প্রতি তারা গৌরব অনুভব করে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতার দেশ ভারতবর্ষের ইতিহাস মুছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বিদেশি আক্রমণকারীর দল। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ধ্বংস করা থেকে শুরু করে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত তারা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল। তারপর সুচতুর ইংরেজ কৌশলে প্রচার করে যে ভারতের কোনো ইতিহাস নেই। শুধু তাই নয়, ভারতবাসীকে মানসিকভাবে হীন করে দেওয়ার জন্য মনগড়া গল্প লিখে তাকে ইতিহাস বলে চালাতে শুরু করে। এতেও থেমে না থেকে কয়েকজন ভারতীয়কে তাদেরই শংসাপত্র দান করে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করার কাজে নিয়োগ করে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতবাসী ভেবেছিল সত্য ইতিহাস লেখা ও গবেষণা শুরু হবে। সেই মতো কাজও শুরু হয়। দিল্লীতে ঐতিহাসিক ড. তারাচাঁদের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. সুরেন সেন ও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারকে নতুন ইতিহাস লেখার জন্য ডাকা হয়। খুব আশ্চর্যের কথা, প্রথম দিনেই উচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশ আসে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলন থেকে লেখা শুরু করতে হবে। তার আগের কোনো উল্লেখ করা চলবে না। তাতে ড. মজুমদার আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, As a 'Historian how can I ignore an established fact' এবং কমিটি থেকে পদত্যাগ করে চলে আসেন। তখন থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ভারতবাসীর মনে দেশের সম্পর্কে হীন ভাবনা নির্মাণের কাজ করে চলেছে মেকলে ও মার্কসপুত্ররা।

কিন্তু সত্যিকারের যাঁরা ইতিহাস গবেষক তাঁরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁরা কোনোরূপ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মুখোপেক্ষী না থেকে স্থানীয়ভাবে ইতিহাস গবেষণার কাজ করে চলেছেন। মাতৃভূমির সেবা হিসেবেই এই কাজে তাঁরা ব্রতী হয়েছেন। কারণ তাঁরা জানেন, অতীত গৌরবে জাতিকে সমৃদ্ধ করাই ঐতিহাসিকের কাজ। বাঁকুড়া শহরের বিপ্লব বরাট এরকম একটি কাজে হাত দিয়েছেন। 'প্রশ্ন ও উত্তরে স্মরণীয় বাঁকুড়ার বরণীয় মনীষী' নামে বাঁকুড়া বিষয়ক গবেষণা ভিত্তিক পুস্তক তিনি বাঁকুড়াবাসীকে উপহার দিয়েছেন। ইতিহাস রচনা করা যায় না, প্রকাশ করতে হয়। তিনি বাঁকুড়ার ইতিহাস প্রকাশ করেছেন।

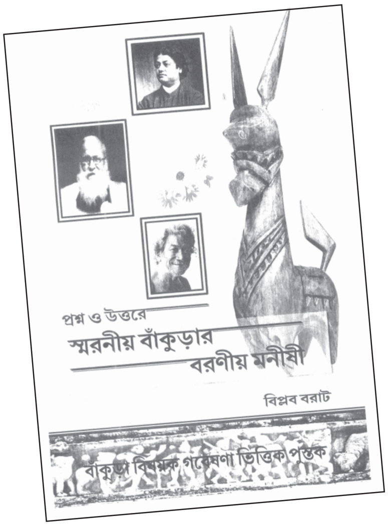

কেউ কেউ মনে করেন ইতিহাস শুধু সাল, তারিখ ও যুদ্ধবিগ্রহের কচকচিতে ভরা নীরস একটি বিষয়। বিপ্লব বরাট খেলাচ্ছলে প্রশ্ন-উত্তর বা ক্যুইজের মাধ্যমে বাঁকুড়ার ইতিহাস যে কারো মনে, বিশেষ করে বাঁকুড়ার যে কোনো লোকের মনে সুন্দরভাবে প্রোথিত করার কাজটি সুন্দরভাবেই সম্পন্ন করেছেন। কত অজানা তথ্য তিনি মনের মণিকোঠায় বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন, ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর রচিত 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটি এখনও মানুষের মনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, কিন্তু আমরা প্রায় জানিই না গানটির রচয়িতা কে? কোথায় তিনি থাকতেন? এরকম অনেক তথ্যে বইটি সমৃদ্ধ করেছেন বিপ্লববাবু। স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাঁকুড়ার প্রশাসনিক গঠন, জেলার নদনদী, পাহাড়-পর্বত, প্রত্ননিদর্শন, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং কয়েকজন মনীষী বিষয়ক ১২টি প্রশ্নোত্তর অধ্যায়-সহ মোট ৫৩টি অধ্যায়ে ৮০ পৃষ্ঠায় বাঁকুড়ার ইতিহাসকে গ্রথিত করেছেন তিনি। পর্যটকরা শুধু মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর দেখেই ফিরে আসেন, বইটি হাতে পাওয়ার পর তাঁরা নিশ্চয়ই বাঁকুড়া শহরের ২৪টি ইমারত দেখে যেতে ভুল করবেন না। কেননা ঐতিহাসিক ইমারতগুলিতে এখনো ইতিহাসের ফিসফিসানি শুনতে পাওয়া যায়।

বাঁকুড়ার স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে ইতিহাস অনিসন্ধিৎসু যে কোনো ব্যক্তির কাছে বইটি শুধু সুখপাঠ্যই নয়, একটি ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলও বটে। স্বল্প পৃষ্ঠায়, স্বল্পমূল্যে ও কয়েকজন মনীষী ও টেরাকোটার চিত্র সম্বলিত প্রচ্ছদে বইটি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে। সেদিক দিয়ে লেখক নিঃসন্দেহে বাঁকুড়ার ইতিহাসের একজন প্রকৃত গবেষক।

প্রশ্ন ও উত্তরে স্মরণীয় বাঁকুড়ার বরণীয় মনীষী। লেখক : বিপ্লব বরাট। নিদর্শন সাহিত্য প্রকাশনী। সেকেন্ড ফিডার রোড, লালবাজার বাঁকুড়া-৭২২১০১। মূল্য : ৫০ টাকা।

শিলিগুলিতে ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের কর্মশালা

“বছরে পাঁচলাখ ধর্মান্তরকরণ বন্ধ করতে পারলে এবং পাঁচলাখ ধর্মান্তরিত হিন্দুকে পরাবর্তনের মাধ্যমে পুনরায় মূল হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে আনলে ভারতে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবে। অন্যথায় ২০৫০-এ এদেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে।”

শিলিগুড়িতে এক অনুষ্ঠানে গত ২০ এপ্রিল একথা বলেন ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের অখিল ভারতীয় পরিযোজনা প্রমুখ শরদরাওজী ঢোলে। (১৯-২০, এপ্রিল) শিলিগুড়িতে চার্চরোড স্থিত মারোয়াড়ী পঞ্চায়েত ভবনে উত্তরবঙ্গের ধর্মজাগরণ সমন্বয় বিভাগের দু’দিনের কর্মশালা (অভ্যাসবর্গ) অনুষ্ঠিত হয়। সাতটি জেলা থেকে ৫৫ জন যোগ দেন। তাদের মধ্যে ১৫ জন মহিলা।

তিনি আরও বলেন, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের স্মৃতি অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনাদায়ক। সেই সময়ে সারাদেশে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২৪ শতাংশ। মোট ৭৬ টি জেলাতে ৪০ থেকে ৮০ শতাংশ ছিল মুসলমান। ২০১৫-তে পুনরায় ১৯৪৭-এর অবস্থা দেখা যাচ্ছে। ৫৪টি সীমান্তে জেলা মুসলমান বহুল। দেশে মুসলমান ও খৃষ্টান জনসংখ্যা যথাক্রমে ১৪.৬ এবং ৬.১ শতাংশ। ১৯৪৭-এ দেশে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল মাত্র দুই হাজার।

বর্তমানে খণ্ডিত ভারতে মাদ্রাসার সংখ্যা ৪০ হাজার। ইউপিএ সরকারের আমলে গঠিত সাচার কমিটির সুপারিশ মেনে মুসলমানদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। হিন্দু সমাজকে অটুট রাখতে হিন্দুদের আরও কট্টর হিন্দু হতে হবে এবং করতে হবে। প্রদেশের ধর্মজাগরণ বিভাগের প্রমুখ দেবাশিস লালা ও বিদ্যুৎ রায় বর্গে উপস্থিত ছিলেন।

রায়গঞ্জে শিক্ষকদের কর্মশালা

গত ১৯ এপ্রিল উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ইন্সটিটিউট মঞ্চে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ এবং বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের একটি শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালাতে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের রাজ্য সভাপতি অবনী ভূষণ মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক অরূপ সেনগুপ্ত এবং সংগঠন সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র পাল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সাহা।

এই কর্মশালায় ভারতীয় শিক্ষার অতীত ও বর্তমান, মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা এবং শাশ্বত মূল্যবোধ —এই তিনটি বিষয় এর ওপর আলোচনা করেন সুধাংশু জ্যোতি রায়, বনমালী পাল এবং অবনীভূষণ মণ্ডল। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের সভাপতি পুলকপতি ত্রিবেদী, সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক এবং বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সভাপতি রাজ নারায়ণ দাস, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত সরকার-সহ জেলার ১০৫ জন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক।

উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর প্রান্ত বৈঠক

গত ৭ এপ্রিল শিলিগুড়ির মাধব ভবনে উত্তরবঙ্গ সংস্কার ভারতীর প্রান্ত কার্যকর্তা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে কার্যকর্তাদের পথনির্দেশ করেন সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ-সংগঠন সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণমূর্তি। বৈঠকে বিশেষ ভাবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত।

বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন ও সমিতি গঠন

গত কয়েক মাসে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে বেশ কয়েকটি জেলা সমিতি নির্মাণ হয়েছে :

উত্তর দিনাজপুর : সভাপতি --- রাজনারায়ণ দাস, সম্পাদক— সুব্রত সরকার, কোষাধ্যক্ষ— সঞ্জয় হালদার।

কোচবিহার : সভাপতি --- নারায়ণ সরাকার, সম্পাদক— তপন ভৌমিক।

পূর্ব মেদিনীপুর : আহ্বায়ক— মনীশ সাউ, সুরজিৎ কর্মকার, শ্রীমন দাস।

নদীয়া : আহ্বায়ক— বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সুশীল বিশ্বাস, তপন বিশ্বাস।

২৪ পরগনা : সভাপতি--- সদানন্দ গোস্বামী, যুগ্ম-সম্পাদক— দীপক সরকার, অসীম বিশ্বাস, সরোজ মণ্ডল, কঙ্কন মণ্ডল।

দক্ষিণ দিনাজপুর : সভাপতি --- জয়ন্তপ্রসাদ দে, সম্পাদক--- বিজয়কৃষ্ণ সরকার।

শিলিগুড়ি : আহ্বায়ক— অভীক রায়।

সমস্ত জেলা সমিতির বৈঠকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীনেশ চন্দ্র সাহা উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

গত ১৮ এপ্রিল কোচবিহার জেলার মাথাভাঙার স্বয়ংসেবক ও সংস্কৃত ভারতীর কার্যকর্তা বিপ্লব সাহার পিতৃদেব রাধাগোবিন্দ সাহা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। কন্যাও সেবিকা সমিতির সঙ্গে যুক্ত।

***

গত ১৮ এপ্রিল শনিবার মাথাভাঙ্গা নগরের ঠাকুর-পঞ্চানন শাখার মুখ্যশিক্ষক সঞ্জয় শর্মার ঠাকুরদা চিতেন্দ্র নাথ শীল শর্মা ৯৬ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

সম্মেলনের মঞ্চে রয়েছেন ডা: সুকুমার মণ্ডল, আর এস এসের সর্বভারতীয় সহ-প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত এবং ডা: জয়দেব কুণ্ডু।

Swastika

The Nationalist Bengali News Weekly
Published on every Monday

ADVERTISEMENT TARIFF

Back Cover (Multi Colour) -	Rs.	32,000.00
Front Inside (Multi Colour) -	Rs.	25,000.00
Back Inside (Multi Colour) -	Rs.	25,000.00
Full Page (Multi Colour) -	Rs.	20,000.00
Full Page (Black/White) -	Rs.	15,000.00
Half Page (Black/White) -	Rs.	8,000.00
Qtr. Page (Black/White) -	Rs.	4,000.00

MECHANICAL DETAILS

Width of a col. 7.7 cms.
Length of a col. 23 cms.
Size of printed page 23 X 16
Overall size 26 X 19
Columns per page 2

MATERIALS REQUIRED

PDF / Tiff File (CMYK) for colour
Artpull for Black & White

27/1B, Bidhan Sarani,
Kolkata- 700 006,
M : 9874080343, Phone : 033-22415915
e-mail : swastika5915@gmail.com, web. : eswastika.com
Cheque/D.D should be drawn in favour of SWASTIKA.

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana™
SAREES

Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ
সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,
রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!

অক্ষয় কুমার পালের
ফোল্ডিং ছাতা
বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

প্রকাশ, গোপীচাঁদের পাশে সাইনা নেওয়াল

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাডমিন্টনের উইম্বলডন' অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেও শেষ পারানির কড়ি জোগাড় করতে পারলেন না সাইনা নেওয়াল। একটুর জন্য প্রকাশ পাড়ুকোন, পুলেল্লা গোপীচাঁদের কীর্তি গরিমার অংশীদার হতে পারলেন না অলিম্পিকে একমাত্র পদকজয়ী ভারতীয় শাটলার। তবে দুই সুখ্যাত পূর্বসূরির পাশে বসার কৃতিত্বটুকুই বা কম কিসের। আর গোপীচাঁদের অ্যাকাদেমিতে বেড়ে ওঠা সাইনা কিন্তু আত্মবিশ্বাসী অল ইংল্যান্ড খেতাব একদিন না একদিন তাঁর বাড়ির ড্রায়িংরুমের শোকেসে শোভা পাবে। স্বয়ং প্রকাশ পাড়ুকোন তাঁর সম্পর্কে গর্বিত প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেছেন, সাইনাই প্রথম ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড় যিনি অলিম্পিক পদক জেতার পাশাপাশি অল ইংল্যান্ড খেতাব জেতার যোগ্য দাবিদার। পিভি সিন্ধুর কথা মাথায় রেখেই একথা বলেছেন প্রকাশ। সর্বোচ্চ মঞ্চে শেষ ধাপের লড়াই জিততে গেলে যে আত্মবিশ্বাস, আগ্রাসী মনোভাব ও টেকনিকাল- ট্যাকটিকাল উৎকর্ষের দাবি করে তা সাইনার মধ্যে পুরোমাত্রায় আছে। শুধু দরকার ভাগ্যের সহায়তা।

ব্যাডমিন্টনের আদি যুগে জর্জ টমাস প্রথম ভারতীয় পুরুষ হিসেবে অল ইংল্যান্ড ফাইনালে উঠেছিলেন সেই ১৯৪৮ সালে। তখন অবশ্য ইউরোপের ৩/৪টি দেশই উন্নত ঘরানার ব্যাডমিন্টন খেলত। এশিয়ার ভূমিকা বলার মতো ছিল না। চীন শুরুই করেনি। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা। তাই টমাসের কীর্তি নিয়ে তেমন আলোড়ন পড়েনি ভারতবর্ষের ক্রীড়া সমাজে। ১৯৮০-তে প্রকাশ পাড়ুকোনের অল ইংল্যান্ড খেতাব জয় এদেশের ক্রীড়া সংস্কৃতিতে বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। শুধু ব্যাডমিন্টনেই নয়, সব ব্যক্তিগত খেলায় এর প্রভাব হয় সুদূরপ্রসারী। ডেনমার্কের মর্টেন ফ্রস্ট হ্যানসেন, স্পেন প্রি, ইন্দোনেশিয়ার লিয়েম সুইকিংয়ের মতো মহা তারকাদের অবলীলায় হারিয়ে প্রকাশ যে জয়পতাকা উড়িয়ে ছিলেন, তা দু-দশক পরে আরো উঁচুতে তুলে ধরেন পুলেল্লা গোপীচাঁদ।

প্রকাশ পাড়ুকোন

গোপীচাঁদ

সাইনা নেওয়াল

গোপীচাঁদকে দুর্লঙ্ঘ্য চীনের প্রাচীর অতিক্রম করতে হয়েছিল। প্রকাশের সময়ে চীন নবোদিত শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে। আর গোপীচাঁদকে পূর্ণ প্রভাব চৈনিক শক্তিকে টেক্কা দিতে হয়েছিল। একই সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছিল মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপীয় দেশগুলির শীর্ষস্থানীয় খেলোয়াড়দের চ্যালেঞ্জ। তবে গোপীচাঁদ কিন্তু প্রকাশের মতো অল ইংল্যান্ডের পাশাপাশি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের মুকুট মাথায় তুলতে পারেননি। তাই প্রকাশই ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের ঋত্বিক পুরুষ। এ হেন প্রকাশকেই আদর্শ করে নিজের খেলাকে বর্ণময় ও আক্রমণাত্মক করে নিয়েছেন সাইনা নেওয়াল। গোপীচাঁদ তাঁর অ্যাকাদেমির গুরু হতে পারেন তবে প্রকাশই সাইনার ব্যাডমিন্টনের বেদ-মন্ত্রকে জীবনদায়ী করেছেন। সাইনার খেলার স্টাইল, ব্যাডমিন্টন কেন্দ্রীক জীবনদর্শন প্রকাশকেই মনে পড়ায়। এবার অল ইংল্যান্ড টুর্নামেন্টে সাইনা দাপটের সঙ্গে প্রতিটি রাউন্ডে বিপক্ষের যাবতীয় চ্যালেঞ্জ তুবড়ে দিয়ে ফাইনালে উঠে যান। বিশেষ করে কোয়ার্টার ও সেমিফাইনালে যেভাবে দুই চীনা খেলোয়াড়কে জমি ধরিয়ে দিয়েছেন, তা দেশের ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের চীনাভীতি কাটিয়ে তুলবে বলে ব্যাডমিন্টন বিশেষজ্ঞদের অভিমত। কোয়ার্টার ফাইনালে এশিয়াড সোনাজয়ী প্রচণ্ড আগ্রাসী ও চতুর ওয়াং ইহানকে হারিয়ে চ্যাম্পিনশিপের ভিতটি তৈরি করে নিয়েছিলেন। সেমিফাইনালে আপাত দুর্বল চীনা প্রতিদ্বন্দ্বী সুন-ইউকে হারাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি সাইনাকে। তবে ফাইনালে স্পেনের বিশ্ব ও ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন ক্যারোলিন মারিনের বিরুদ্ধে প্রথম গেম স্বচ্ছন্দে জিতেও যেভাবে 'চোকড' হয়ে পরের দু'টো গেম খুইয়ে বসেন, তা আজীবন ভুলতে পারবেন না হায়দরাবাদী কন্যা।

যে ক্যারোলিন মারিনের কাছে হারতে হলো সাইনাকে তাকে এর আগে তিনবার খেলে তিনবারই হারিয়েছেন সাইনা। গোপীচাঁদের ছাত্রী এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত কোচ হিসেবে বিমল কুমারকে নিয়োগ করেছেন। বিমল কুমার ও আটবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মধুমিতা সিংবিষ্ট পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে সাইনাকে সাহস, শক্তি জুগিয়ে গেছেন। তাঁরাও ভুলতে পারছেন না এভাবে তীরে এসে তরী ডোবার মতো হৃদয়াবিদারক ঘটনাটি। মধুমিতা ও অমি খিয়া ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টনকে আন্তর্জাতিক মাত্রায় উন্নীত করেছিলেন। তাঁদের হাত ধরেই এদেশের মহিলা ব্যাডমিন্টন একটা স্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। সেই বিন্দুকে পূর্ণ বৃত্তে পরিণত করেছেন সাইনা, পি ভি সিন্ধুরা। সিন্ধু পরপর দু'বছর বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সেমিফাইনালে উঠে ব্রোঞ্জ জিতেছে। সাইনা অলিম্পিক ব্রোঞ্জের পর এবার বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের প্রধান গ্রান্ডস্লামে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করলেন। গত বছরের শেষ দিকে সুপার সিরিজের অন্যতম চীন ওপেন খেতাব জিতেছেন। তার সঙ্গে পুরুষ বিভাগে পোডিয়ামে সর্বোচ্চ ধাপে শেষ করেছেন কিদাম্বি শ্রীকান্ত। সাইনা, সিন্ধু, শ্রীকান্ত র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশে আছেন অনেকদিন ধরে। পুরুভেল্লি কাশ্যপ এই বছরেই ঢুকে পড়তে পারেন। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ওপেন জিতে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিয়ে এক নম্বরে উঠে এসেছেন সাইনা নেওয়ালের নাম। সব মিলিয়ে বিশ্ববৃত্তে ভারত উদয় সম্পূর্ণ হওয়ার পথে।

শব্দরূপ-৭৪৫ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

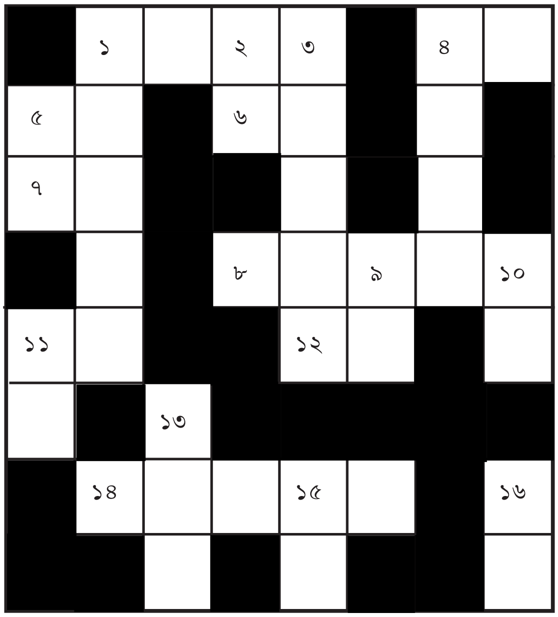

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** ধূর্ত, প্রবঞ্চক, **৪.** কমলকমার মজুমদার-এর চলচ্চিত্রায়িত উপন্যাস, '—অন্নপূর্ণা', **৫.** প্রহার, **৬.** মণ্ড, কাই-এর তুল্য দ্রব্য, **৭.** মান্য; অভিমানী, **৮.** নাপিত, **১১.** অশ্রু (পদ্যে), **১২.** 'যত মত, — পথ', **১৪.** কবিরাজি ওষুধবিশেষ; কথিত আছে ঋষি চ্যবন তাহা সেবন করিয়া নবযৌবন লাভ করিয়াছিলেন।

উপর-নীচ : **১.** পর্বত, বাসুকি, **২.** সুন্দরী; নারী, **৩.** পৌরাণিক রাজর্ষি বিশেষ, (ব্যঙ্গে) অকর্মণ্য, নিষ্ক্রিয়, **৪.** 'মাগো আনন্দময়ী, — কোরো না' **৫.** মায়ের ভাই, **৯.** পুত্র, **১০.** মদনের স্ত্রী, **১১.** 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক/আমি তোমাদেরই —', **১৩.** '—হরিদাস'; ম্লেচ্ছ, **১৫.** 'বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার —' **১৬.** দক্ষকন্যা, ভগবতী।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৪২
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

ব	ন	ব	স	■	ক	ণা	দ
ল	■	দ	হ	র	ম	■	ক্ষি
রা	ম	■	জ	বা	লা	■	ণা
ম	গু	প	■	র	স	■	■
■	■	রে	বা	■	ন	র	ক
গ	■	শ	লা	কা	■	মা	নী
তা	■	না	ম	জ	প	■	নি
সু	র	থ	■	ল	ল	ন্তি	কা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৪৫ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৮ মে ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বান্দা বৈরাগী ।। ২৩

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত নেপালে স্বয়ংসেবকদের ত্রাণ কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপালে স্বয়ংসেবকদের পরিচালিত সেবাকাজ দেখাশোনার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে সহ-সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে-কে পাঠানো হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল লক্ষ্ণৌতে সাংবাদিকদের একথা জানান সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-প্রচার প্রমুখ জে নন্দকুমার। তিনি আরও জানান, নেপালে ভূমিকম্পে-পীড়িত লোকেদের উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা ইতিমধ্যেই শুরু করেছে।

হিন্দু স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় স্বয়ংসেবকেরা ছাড়াও নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের জেলাগুলি থেকেও স্বয়ংসেবকেরা কাঠমাণ্ডুতে পৌঁছে গিয়েছে। উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে তারা স্থানীয় প্রশাসনকে সাহায্য করছে। ইতিমধ্যেই সঙ্ঘের দু'হাজার স্বয়ংসেবক উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে নেমে পড়েছে।

বিজেপি-র গোরক্ষপুরের সাংসদ যোগী আদিত্যনাথ ঘোষণা করেছেন, ভূমিকম্পে পীড়িত লোকেরা গোরক্ষনাথ মন্দিরে আশ্রয় নিতে পারেন। উল্লেখ্য, তিনি ওই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতও। মন্দিরের পক্ষ থেকে তাদের খাদ্য ও গোরক্ষনাথ হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি প্রবীণ তোগাড়িয়া জানিয়েছেন, ইন্ডিয়া হেলথ্ লাইন এবং হিন্দু হেল্প লাইন মেডিকেল টিম নেপালে যাচ্ছে। ভারতের যে সব রাজ্য এই ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেখানেও জেলা-ওয়াড়ি মেডিকেল টিম পাঠানো হচ্ছে। তিনি জনসাধারণের কাছে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার জন্য কমপক্ষে এক হাজার টাকা (১০০০) দান করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

আমেরিকার 'টপ ডক'

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ নতুন দিল্লীতে কৃষকের আত্মহত্যা নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মহলে যখন তোলপাড় চলছে তখন আমেরিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ডাঃ বিবেক মূর্তি 'ডক্টর-ইন-চীফ' সম্মানে ভূষিত হলেন। তিনি এক ভারতীয় কৃষক পরিবারের বংশধর। এই সম্মানে ভূষিত হয়ে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ ভারতীয়দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর কৃষক পিতামহের উৎসাহ ও ত্যাগের ফলে তাঁর পিতা-মাতা আমেরিকায় আসতে পেরেছিলেন এবং এই দেশে তার সাফল্যের মূলেও রয়েছে তাঁদের অবদান।

সাঁইত্রিশ বছরের ডাঃ মূর্তি বলেছেন, অন্য কোনো কারণে তিনি এখানে পৌঁছতে পারেননি। তাঁর বাবা একজন গ্রাম্য কৃষকের সন্তান। এখানে না এলে মনে হয় তিনিও একজন কৃষক হতেন। গত ২৩ এপ্রিল ফোর্ট মায়ার-এর সামরিক ছাউনিতে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বিডেন-এর উপস্থিতিতে আমেরিকার ১৯তম সার্জন জেনারেল হিসাবে শপথ নিলেন ডাঃ মূর্তি। তিনি এখন 'টপ ডক'— আমেরিকার ডক্টর-ইন-চীফ।

পিতামহ ঋণগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাবাকে শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেন। এটা তিনি না করলে কর্ণাটকের মাণ্ডা জেলার হালিগিরি গ্রামের বাইরে তারা কখনও আসতে পারতেন না। দুনিয়াকে এভাবে দেখতে শিখতেন না।

বাবা রামদেবের 'না'

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ হরিয়ানা সরকার বাবা রামদেবকে রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমান মর্যাদা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তা বিনয়ের সঙ্গে ওই মর্যাদা গ্রহণ করতে অপারগ বলে ঘোষণা করেছেন। গত ২১ এপ্রিল সোনিপতে এক সরকারি জাঁকজমকপূর্ণ সভায় বাবা রামদেব বলেন, আমি একজন বাবা, ফকির হিসেবেই থাকতে চাই। আমি আপনাদের শুধু সেবা করতে চাই। উল্লেখ্য, এই সভায় হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার, মন্ত্রী রামবিলাস শর্মা, অনিল ভিজ, কবিতা জৈন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বাবা রামদেব আরও বলেন, মানুষের সেবাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। আমি কোনো মন্ত্রিত্বের মর্যাদা চাই না। আপনারা যে মর্যাদা দিতে চেয়েছেন, তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাই এবং সেইসঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাদের হাতে তা ফিরিয়ে দিতে চাইছি। উল্লেখ্য, যোগ ও আয়ুর্বেদের ক্ষেত্রে তিনি রাজ্যের দূত হিসেবে আগের মতোই কাজ চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
4 May - 2015 - Rs. 10.00